দক্ষিণেশ্বরে [illegible] সারদা

প্রণবেশ চক্রবর্তী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

আমারই মত অকালে যারা মাতৃহারা, সব পেয়েও মাতৃস্নেহের অভাবে যারা শোকে দুঃখে আনন্দে সুখে সারাজীবন ধরে মাতৃস্নেহের কাঙাল, তাদেরই জন্য এই তপস্বিনী মাতৃকাহিনী। তাদেরই জন্য এই চিরকালের মাতৃজীবনের ইতিবৃত্ত।

তাদেরই বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের অবসানে, চিরকালের মায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সেই অমোঘ আশ্বাসবাণী—
"জানবে, তোমাদেরও একজন মা আছেন।"

॥ নিবেদন ॥

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন যখন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এবং বিশ্বজীবনের অন্তরলোকে যখন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তখন এই জীবন-জাগানিয়া আন্দোলনের মূলে পবিত্রতা-স্বরূপিণী এবং অবগুণ্ঠনবতী মা সারদার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ঐতিহাসিক কারণেই অনুধাবন করার সময় উপস্থিত।

শুধুমাত্র রামকৃষ্ণঘরণীরূপেই নয়, স্বীয় জীবনের অনন্ত মাধুর্যে এবং অসীম ঋজুতায় মা সারদা ঐতিহাসিক মহিমায় উদ্ভাসিতা। তিনি নারী দেহে এ পৃথিবীতে ৬৭ বছর প্রতিভাত ছিলেন। এই ৬৭ বছরকে আমরা সুস্পষ্ট তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম ৩৩ বছর তিনি অন্তরালবর্তিনী, অবগুণ্ঠনবতী। শ্রীরামকৃষ্ণ সামনে, তিনি আড়ালে। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে এক বছর তীর্থে তীর্থে তিনি ঘুরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ভাবীকালের সঙ্ঘজননীরূপে প্রস্তুত করেছেন। তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। তারপর বাকি ৩৩ বছর—তিনিই এই ভাব-আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দের অকাল-দেহত্যাগের পরও প্রায় ১৮ বছর তিনি তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনকে মাতৃস্নেহের ফল্গুধারায় প্রেরণা-সিক্ত করেছেন, বরাভয়-দায়িনীর বেশে সতেজ ও সবল করে তুলেছেন।

এই দিব্যসুন্দর মাতৃজীবনের প্রকাশ, বিকাশ এবং বিস্তারের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের ভূমিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পূজার বেদিতে বসিয়ে এই মাতৃপীঠেই এক অভিনব মাতৃসাধনার ইতিহাস রচনা করেছেন। আবার মা সারদা তাঁর অভূতপূর্ব ত্যাগের পরম ঐশ্বর্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সাধনাকে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু মা সারদার মহান জীবনব্রতের এই অধ্যায়টি বাস্তব অর্থেই অনালোচিত। অথচ এই অধ্যায়টিকে ইতিহাসের আলোকে অনুভব করতে না পারলে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মূল শক্তিবিন্দুকে নির্মোহ দৃষ্টিতে অনুসরণ করা সম্ভব হবে না।

অশোকবনে সীতা বন্দিনী ছিলেন। আর দক্ষিণেশ্বরের নহবতে মা সারদা স্বেচ্ছায় বন্দিনী জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। কত কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ, তবু কত দূরে তিনি। মা সারদা ইচ্ছে করলেও স্বামীর কাছে যেতে পারতেন না।

তারপর এক সময় যাওয়ার অধিকারটুকুও স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাঁর একার নয়, তিনি যে সকলের। তাঁর এই বিশ্ব-উদার সর্বজনীনতায় শ্রীমা অতুলনীয়া।

তাই দক্ষিণেশ্বরে মাতৃজীবনের অধ্যায়টিকে উন্মোচন করার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস —যদিও জানি, আমার মত এক দীন-অভাজন লেখকের পক্ষে সেই প্রয়াসে সার্থক হওয়া অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়ার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিবৃত্তও সঙ্গত কারণেই এই সূত্রে আলোচিত হয়েছে, যেমন আলোচিত হয়েছে ১৮৭২ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত কামারপুকুর ও জয়রামবাটির বিভিন্ন ঘটনাও। এইসব ঘটনার আলোকেই দক্ষিণেশ্বরের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সহজ হবে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি শুধু প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আশ্রয় নিয়েছি। ইতিহাসের আলোকে জীবনকথা রচনায় সচেষ্ট হয়েছি। জানি না, মায়ের আশীর্বাদ আমার উপর বর্ষিত হয়েছে কিনা। তবে, আশা আছে, মা তো অধম সন্তানকেই বেশি স্নেহ করেন।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে নাথ পাবলিশিং-এর সমীর নাথ প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর উৎসাহ আমাকে উৎসাহিত করেছে। এখন এই মহাজীবন-কথা পাঠকদের প্রত্যাশা সামান্যমাত্র পূর্ণ করতে পারলেই আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করব। ইতি—

বিনীত

প্রণবেশ চক্রবর্তী

দক্ষিণেশ্বরে মা সারদা

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা

তখন নাম ছিল জাহানাবাদ, এখন আরামবাগ।

সেই আরামবাগ পেরিয়ে হুগলি জেলার শেষপ্রান্তে মন্দিরময় গ্রাম কামারপুকুর। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে আমোদর নদ। সেখানেই নদীর আঁকাবাঁকা রেখা বরাবর হুগলি জেলার সীমানা শেষ। নদী পেরিয়ে শুরু হল বাঁকুড়া জেলা। জেলার শুরুতেই জয়রামবাটি গ্রাম। দুই জেলার দুই গ্রাম দুই মাইলের ব্যবধানে দুই মহাজীবনের ধাত্রী।

কামারপুকুর গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। পরম নিষ্ঠাবান এবং সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর—আজকের পৃথিবী যাঁকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে।

আর জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সারু—প্রেম প্রীতি করুণার জীবন্ত প্রতিমা। সেই সারুই পরবর্তীকালের জননী সারদামণি—শ্রীরামকৃষ্ণ-ঘরনী। অবতারের লীলাসহচরী। বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের জননী।

কামারপুকুরে পতিগৃহে ছিলেন সারদা। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। জননী সারদা চলে এলেন পিতৃগৃহে—জয়রাম-বাটিতে। আসতে মন চায়নি, তবু আসতে হয়েছে। ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটিতে আসেন। বিয়ের পর সেবারই তিনি পঞ্চমবারের জন্য পতিগৃহে গিয়েছিলেন।

তারপর দেখতে দেখতে চার বছর পার হয়ে গেল। অজানা-অচেনা

দক্ষিণেশ্বরের কোন খবর তিনি পান না, তবু মন দুর্গম পথ পার হয়ে ছুটে যায় বারবার সেই না-দেখা মন্দিরের দ্বারদেশে। বারবার উচ্চকণ্ঠে বলতে চায় মন : প্রভু দ্বার খোল, আমি এসেছি।

ইতিমধ্যে লোকমুখে খবর আসে। তিল থেকে ধীরে ধীরে তাল হয়। লোকমুখে প্রচারিত হয়, "সারুর বর ঘোর উন্মাদ।" সহানুভূতির বহর বাড়িয়ে কেউবা বলল, "মেয়েটাকে একটা পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।"

কলকাতার বিখ্যাত জমিদার রানী রাসমণির বিশাল মন্দিরের পুরোহিত গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারুর বিয়ে হয়েছে—এই সংবাদে এতকাল যারা কিছুটা বিষণ্ণ ছিল, এবার তারা প্রচ্ছন্ন উল্লাসে খবরটাকে আরও বেশী করে বাতাসে ভাসিয়ে দিল।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, একটা পাগলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। খবরটা এ-কান থেকে সে-কানে, তারপর এক সময় সারদার কানেও গেল।

সেদিনের সেই গ্রাম্য পরিবেশে এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে জননী সারদাকে কঠিন সহনশীলতার ব্রত উদযাপন করতে হয়েছিল। স্বামী উন্মাদ—এমন কথা শুনেও প্রমাদ গোনেন নি তিনি। নিজেকে শক্ত করেছেন, কঠিন করেছেন।

তবু মায়ের মনে সুখ নেই, প্রাণে কোন আনন্দ নেই—তিনি যেন বিষাদ-প্রতিমা। আগেকার সেই জ্যোৎস্না-মধুর প্রসন্নতা তাঁর দিব্য মুখমণ্ডল থেকে যেন চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেছে।

সংসারের সব কাজ তিনি করে চলেছেন, কোন ব্যাপারে যেন তাঁর বিতৃষ্ণা নেই। ঠিক যেন যন্ত্রের মত তিনি কাজ করে চলেছেন, দেহ তাঁর সক্রিয়, কিন্তু মন যেন উধাও হয়ে গেছে কোন এক মহাশূন্যতার গভীরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা তাঁর জীবনে তখন চরম মর্মভেদী। চোখে মুখে সেই বেদনার ছায়া।

সারুর এই অবস্থা দেখে গ্রামের অন্য মেয়েরাও আসে তাঁর কাছে,

জানায় সহানুভূতি। অন্য বাড়ির বধূরাও আসে দুঃখের ভাগ নিতে। কিন্তু গ্রাম্য কথাবার্তায় এমনই অসংযত সহানুভূতি প্রকাশিত হয় যা শেষ পর্যন্ত জননীর জীবনে হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

স্বামী যার পাগল তাঁকে কে আর কী সান্ত্বনা দেবে? এমন সুন্দর জয়রামবাটি, এমন স্নেহময়ী গ্রাম—তাও আজ সারদার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কোথায় দক্ষিণেশ্বর—তা তিনি জানেন না। কী ভাবে যেতে হয় সেখানে—তাও তিনি জানেন না। কিন্তু মন যে তবু সেখানেই শুধু ছুটে যেতে চায়, নিজের চোখে দেখতে চায়—তিনি কি পাগল? অমন মানুষ কি সত্যি পাগল হতে পারে?

তবে যে ভানুপিসী বলতেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং মহাদেব! সে কথা কি মিথ্যা হতে পারে? জননীর এই দুঃখকাতর জীবনে সেদিন ভানুপিসীর বাড়িটাই ছিল একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়, একমাত্র আশ্বাসের অবলম্বন।

* * *

জয়রামবাটির সদ্গোপ বংশীয় ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে ভানুপিসী। মায়ের বাড়ির কাছেই ক্ষেত্র বিশ্বাসের বাড়ি এবং তাঁরা ছিলেন রামচন্দ্র মুখুজ্জের যজমান। গ্রাম সুবাদে মা ভানুপিসীকে 'পিসী' বলেই ডাকতেন।

কিন্তু এই ভানু নামটা কীভাবে এল সেটাও একটু জেনে রাখা ভালো। আদিতে নাম ছিল মানগরবিনী—ক্রমে সেই নাম হয়ে যায় "মানু" এবং তারপর কখন এবং কীভাবে "মানু" যে "ভানু" হয়ে গেল, সে রহস্য এখন আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ভানুপিসীর অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল জয়রামবাটির দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলুই-শ্যামবাজারে। একটি কন্যাসন্তানও হয়েছিল তাঁর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচেনি। যখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর বয়স, তখনই বিধবা হন তিনি। তারপরই আবার ফিরে আসেন জয়রামবাটিতে পিতৃগৃহে।

সঙ্গে করে তিনি নিয়ে এসেছিলেন গভীর বৈষ্ণব-ভাব। সেকালের

ওই শ্যামবাজার গ্রাম ছিল বৈষ্ণব-প্রধান। এই বৈষ্ণব-ভাবের জন্য ভানুপিসীকেও পিতৃগৃহে অনেক লাঞ্ছনা এবং যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর দাদা গৌর বিশ্বাস ছিলেন ঘোরতর বৈষ্ণব-বিরোধী এবং যদিও তাঁর নাম ছিল গৌর, তবু গৌর-ভক্তির জন্যই ভানুপিসীকে কষ্ট দিয়েছেন বারবার। অথচ ভানুপিসী তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তিতে অটল।

কামারপুকুরে চিনু কাঁসারি যেমন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সম্ভাবনাকে শিশু গদাধরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি ভানু-পিসীও চিনেছিলেন তাঁর স্বরূপ।

নতুন জামাই গদাধর মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসতেন। জয়রাম-বাটির অনেকেই আড়ালে বলতেন "মুখুজ্যেদের ক্ষেপা জামাই," কিন্তু ভানুপিসী এই "ক্ষেপা জামাই"য়ের মধ্যেই সেদিন এক মহাপুরুষের অনিবার্য সম্ভাবনাকে অনুভব করে তৃপ্ত হতেন। তিনি একবার সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরীকে বলেছিলেন, "বউঠাকরুণ, তোমার জামাই শিব, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—এখন যা বিশ্বাস করতে পারছ না, পরে পারবে বলে রাখছি।"

বিয়ের পর দ্বিতীয়বার যেবার গদাধর এলেন জয়রামবাটিতে এবং কামারপুকুরে মাকে নিয়ে জোড়ে ফিরে গেলেন, সেবার ভানুপিসী হরগৌরীর কথা স্মরণ করে গান গেয়েছিলেন, "নাতনী, তুই যেমন সুরূপা, তোর বর জুটেছে ন্যাংটা ক্ষেপা।"

* * *

জয়রামবাটির লোকমুখে পতিনিন্দা শুনতে শুনতে একালের সতী যখন দিশেহারা হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর একমাত্র স্নেহচ্ছায়া ছিল ওই ভানুপিসীর ঘর।

মোহাচ্ছন্ন মানুষকে নবজীবনের অমৃতবার্তায় সঞ্জীবিত করার জন্যই যাঁর অবতরণ, সেই সতী সারদা তো পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করতে পারেন না—তাঁর সামনে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের পথ। তিনি যে মানুষের দুঃখ-শোককে স্ববক্ষে ধারণ করতেই এসেছেন, তাই দেহ ধারণ

করেই তাঁকে জয়রামবাটির সেই অসহনীয় পরিবেশে বেঁচে থাকতে হয়েছিল।

পতিনিন্দা শোনার ভয়ে কোন বাড়িতে যেত পারতেন না তিনি। ঘরেই নিজেকে বন্দী করে রাখতেন, আর সব সময় ডুবিয়ে রাখতেন কাজের মধ্যে। কাজ আর কাজ—যিনি নরদেহ ধারণ করে কাজ করতেই পৃথিবীতে এসেছেন, যিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের প্রাণ তালপাতার পাখার হাওয়া দিয়ে জুড়িয়ে দিতে এসেছিলেন—তাঁর সেই অবিরাম কাজের সূচনা জয়রামবাটির ভূমিতেই। এত কাজের মধ্যে যখন একটু শান্তি, একটু স্বস্তির জন্য মন হাঁফিয়ে উঠত, তখনই তিনি সকলের অলক্ষ্যে চলে যেতেন ভানুপিসীর বাড়িতে। বাড়ির বারান্দায় নিজের আঁচল বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেন নীরবে—যতক্ষণ সেখানে থাকা, ততক্ষণই শান্তি। ভাবেন তিনি আপন মনে, সবাই বলে বলুক, তবু বিশ্বাস করি না। অমন মানুষ কি পাগল হতে পারে কখনও?

মন চায় একবার নিজের চোখে দেখে আসতে।

সেই সুযোগও এসে গেল হাতের কাছেই। ১৮৭২ সালের মার্চ মাস তখন। বাংলা ১২৭৮ সনের চৈত্র মাস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব লগ্নের পুণ্যযোগ ছিল সেবার। জয়রামবাটির অনেক নারীপুরুষ গঙ্গাস্নান করার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। মায়ের কানেও পৌঁছেছে সে সংবাদ। তিনি বুঝলেন, এই সুযোগ এসেছে। কিন্তু মুখ ফুটে একথা পিতা-মাতাকে বলবেন কী ভাবে? কী ভাববেন তাঁরা? তিনি তো শুধু গঙ্গাস্নানে যেতে চান না, যেতে চান পতিদেবতাকে একবার নিজের চোখে দেখতে।

শেষ পর্যন্ত গ্রামেরই একটি মেয়েকে মনের কথা খুলে বললেন তিনি। মেয়েটি গিয়ে সেই বার্তা পৌঁছে দিলেন রামচন্দ্র মুখুজ্জের কাছে। রামচন্দ্র সবকিছু শুনলেন, বুঝলেনও সবকিছু, বললেন, "যাবে? বেশ তো।"

একথা বললেন বটে তিনি, কিন্তু কন্যাকে অন্যান্যদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না, নিজেও চললেন তাঁদের সঙ্গে। তিনিও একবার

সবকিছু স্বচক্ষে দেখতে চান।

* * *

দূরত্বের পরিমাপে কলকাতা বা দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটি তেমন বেশি কিছু দূর নয়। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন যাতায়াত ছিল এক কঠিন তপস্যা, পথ ছিল ভয়ঙ্কর দুর্গম। অনেকে জয়রামবাটি থেকে পায়ে হেঁটে কামারপুকুর আসতেন, তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই বেঙ্গাই চৌরাস্তা, কুমারগঞ্জ, একলকী ও উচালনের পথ ধরে বর্ধমানে চলে আসতেন। অবশ্য যত সহজে ব্যাপারটা লিখে ফেললাম, আসাটা তত সহজ ছিল না। দুর্গম পথ একটানা বেশিক্ষণ হাঁটা যেত না,—রাত্রে পথ চলা ছিল না নিরাপদ। তাই পথে পথে চটিতে বিশ্রাম করতে হত।

যাঁরা কিছুটা বিত্তবান ছিলেন, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে পালকিতে চড়েই যাতায়াত করতেন। কিন্তু তাতে পথের শ্রম লাঘব হত ঠিকই, তবে পথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হত না বা পথও নিরাপদ ছিল না। পথে পথে ছিল দস্যু বা ডাকাতের ভয়। মালপত্র দিনে দিনে গরুর গাড়িতেই বহন করা হত। উচালন নামের গ্রামটা বর্ধমান থেকে যেমন ষোল মাইল, কামারপুকুর থেকেও প্রায় তাই।

এছাড়া আরেকটা পথও ছিল। কামারপুকুর থেকে তখনকার জাহানাবাদ বা এখনকার আরামবাগ এসে সটান তেলোভেলোর মাঠ পায়ে হেঁটে পার হয়ে শৈবতীর্থ তারকেশ্বর। জয়রামবাটি থেকে তারকেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ মাইল—পথে দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী এবং দামোদর নদ পার হতে হয়। এই পথের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কম ঠিকই, কিন্তু তারকেশ্বরের আগে তেলোভেলোর মাঠ এবং পরে কৈকালার মাঠ ছিল খুবই ভয়াবহ। ঠগী দস্যু এবং লাঠিয়াল ডাকাতদের হাতে প্রায়ই অসহায় পথিকদের সর্বস্বান্ত হতে হত। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও দিতে হত।

বর্ষার সময় এই পথ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ত। তখন অনেকেই আরামবাগে গিয়ে নৌকায় এবং পরবর্তীকালে স্টিমারে

কোলাঘাটে গিয়ে সেখান থেকে কলকাতায় যেতেন। এখন কলকাতা থেকে সরকারি দূরপাল্লার বাসে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে মানুষ জয়রামবাটি চলে যাচ্ছেন। সকালে গিয়ে রাত্রে ফিরে আসছেন। তখন তিন দিন তিন রাত্রি লেগে যেত।

এরপর রেল ব্যবস্থা কিছুটা প্রসারিত হওয়ায় কলকাতা থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনেই চলে যাওয়া যেত। পরবর্তীকালে মা সারদাও এই পথে কলকাতায় এসেছেন জয়রামবাটি থেকে। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে কোতুলপুর, কোয়ালপাড়া ও দেশড়া হয়ে জয়রামবাটি।

* * *

জয়রামবাটি থেকে আরামবাগের দূরত্ব এগারো মাইল। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজের কন্যা সারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে আরামবাগ হয়ে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা শুরু করলেন। মোট পথের দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল।

জননী সারদা এক নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে চলেছেন পায়ে হেঁটে। চার বছর আগে শেষবারের মত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কামারপুকুরে দর্শন করেছেন, সেই মধুর স্মৃতি সব সময় তাঁর মনে জাগরূক। সে সময় তিনি একটানা সাত মাস পতিসঙ্গে মধুর জীবন কাটিয়েছেন।

* * *

এই অবসরে আমরা চার বছর আগের ঘটনা একটু স্মরণ করতে পারি।

সেটা ১৮৬৭ সালের মে মাস। বাংলা ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ। শক্তিপীঠ দক্ষিণেশ্বরে প্রাণসমর্পিত সাধনার পর ভাগ্নে হৃদয় এবং দীক্ষাগুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এলেন। জননী তখন ছিলেন পিতৃগৃহ জয়রামবাটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে কামারপুকুরে আনালেন। এই নিয়ে আসার পিছনেও ছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ আগেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক-

ভাবে তিনি তোতাপুরীর কাছেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এও এক বিচিত্র বিধান। ভগবান শ্রীচৈতন্য দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে আর সাড়ে তিনশ' বছরের ব্যবধানে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তোতাপুরীর কাছে। "দশনামী" সম্প্রদায়ের মধ্যে "পুরী" সম্প্রদায়ই যেন বিধাতার নির্দেশে বাংলার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

* * *

সেবার শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে নিয়েই কামারপুকুরে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। সেই পটভূমিকাটা একটু স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণি শরীর ত্যাগ করে দেবীলোকে গমন করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বাগানে ফুল তুলছেন, এমন সময়ে একটি নৌকা এসে ভিড়ল বকুলতলার ঘাটে। সেই নৌকা থেকে গৈরিক বসনে প্রদীপ্তা এবং আলুলায়িত দীর্ঘকেশে ব্যক্তিত্বমণ্ডিতা এক সুন্দরী মহিলা এসে নামলেন। তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনির দিকে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন: "ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাঁদনি হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন? ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, আমার নাম বলিলেই আসিবে।" (ভৈরবী-ব্রাহ্মণী সমাগম, পৃঃ ১৮৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনেই তিনি এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির যেন মাতৃমহিমার পরম ঐশ্বর্য প্রকাশ করার জন্যই ছিল অপেক্ষমাণ।

রানী রাসমণি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন—সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা মা ভবতারিণী। সেখানে এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। আর সবশেষে আসবেন মা সারদা।

ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকেই আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হলেন, সজল নয়নে বললেন, 'বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনেই তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এতকাল। এতদিনে দেখা পেলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণও বিস্মিত। প্রশ্ন করলেন, 'আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা?'

ভৈরবী বললেন, 'তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এ কথা মা জগদম্বাই আমাকে জানিয়েছেন। দু'জনের দেখা পূর্ববঙ্গে পেয়েছি। এখন তোমার দেখা পেলাম।'

এই ভৈরবীই ঘোষণা করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার, নর-দেহে নারায়ণ, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র সাধনার শুরু। সে এক দুশ্চর সাধনা। কিন্তু যিনি সর্বসাধনার সিদ্ধিদাতা, যিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশ, যিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্যই নরদেহে পৃথিবীতে এসেছেন —তাঁর কাছে দুশ্চর বলে কিছু নেই, কঠিন বা দুরতিক্রম্য বলেও নেই কিছু।

তন্ত্রসাধনার শেষে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শ্রীশ্রীগণপতির যেমন রমণীমাত্রেই মাতৃভাব, 'আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব"।

এই প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন: "রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তন্ত্রোক্ত বীর ভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোনও যুগে কোন সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধক মাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্ভব। নিজ পাশব

প্রবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধকেরা কখন কখন পরকীয়া শক্তিগ্রহণেও বিরত থাকেন না। লোকে ঐজন্য তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দিষ্ট বীরাচারমতের নিন্দা করিয়া থাকে।”

* * *

এই কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরই ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গেলেন। চার বছর আগে সেই তাঁর আসা। তারপর নিজের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের যথার্থ প্রমাণলাভের জন্যই জননী সারদাকেও নিয়ে এলেন জয়রামবাটি থেকে।

শুধু মুখে বললে হয় না, স্বীয় জীবনে তার প্রমাণও দিতে হয়— শ্রীরামকৃষ্ণই ধর্মকে সেই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই “রমণীমাত্রে মাতৃভাব”—এই কথাটি বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সেই সত্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই জননী সারদাকে নিয়ে এলেন কামারপুকুরে।

সেবার একটানা সাত মাস শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সান্নিধ্যে থেকে মা সারদাও যেন এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। কিশোরী সারদা ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধনার উত্তরাধিকারিণীরূপে জগতে মাতৃত্বের মহিমা প্রচারের জন্য সেদিন থেকেই যেন প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ভাবীকালের সেই মহাসম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেননি, তাই অহেতুক হয়ে পড়েছিলেন মা সারদা সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর। শেষ পর্যন্ত ভৈরবী নিজের ভুল বুঝতে পারেন, এবং অনুতাপে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। তারপর নবযুগের মহাতীর্থ কামারপুকুর থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অনন্তকালের তীর্থভূমি কাশীতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাত মাস কামারপুকুরে থেকে আবার ফিরে গেলেন মাতৃতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে, আর মা সারদা চলে আসেন শক্তিপীঠ জয়রামবাটিতে।

তারপর পতিনিন্দা শোনার সুদীর্ঘ চার বছরের সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করে অগ্নিশুদ্ধা মা সারদা এবার চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বিরাজ করছেন মা ভবতারিণী, আর মন্দির-

চত্বরের বাইরে নহবতখানা মা সারদার মন্দিরে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যই যেন মহাকালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে অপেক্ষা করে আছে। শেষ পর্যন্ত নহবতখানার সেই স্বল্পপরিসর অস্তিত্বই একালে মাতৃমহিমার জয়ধ্বনিতে এক মহিমান্বিত মন্দিরে পরিণত হয়েছে—যেখানে লক্ষ মানুষের প্রণাম নিবেদিত হয় প্রতিদিন।

* * *

ভাবীকালের সেই শূন্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ার জন্যই মা সারদা পথের দুঃখকষ্টকে হেলায় তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। তিনি তখন নতুন উদ্দীপনায় চঞ্চল। সঙ্গে চলেছেন তাঁর সঙ্গিনীরা। আর চলেছেন পিতা রামচন্দ্র।

পথ যেন অসীম, হারিয়ে গেছে দিগন্তের নীল সমুদ্রে। পথের পাশে অবারিত প্রান্তর—আর সেই প্রান্তরের সীমাও গিয়ে একসময় অসীম নীল আকাশের গভীরতায় ডুবে গেছে। এই দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সারদা মা-ও যেন অসীমের লীলাকেই মনেপ্রাণে অনুভব করছেন। কোন বন্ধন নেই, নেই কোন বিরতি, শুধু মুক্তির আহ্বান।

আবার কখনও প্রান্তরের বুক জুড়ে সবুজের অভিষেক। রবিশস্যের সবুজ অস্তিত্ব প্রান্তরের ধূসরতাকে দূর করে প্রসন্ন সজাবতায় জীবন্ত।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় প্রান্তরের রেখা যায় হারিয়ে, পথ এসে আশ্রয় নেয় গ্রামের আড়ালে। আম-জাম-নারকেল গাছের ছায়া দিয়ে ঢাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন এক একটা দ্বীপের মত। ক্ষণিক বিশ্রাম, ক্ষণিক প্রশান্তি। তারপর আবার পথ চলা। আবার পায়ে হাঁটা।

পথ চলার ক্লান্তি যেমন আছে, তেমনি আছে আনন্দও। প্রতপ্ত প্রান্তরের বুকে কাকচক্ষু জলে ভরা দীঘিগুলি যেন সজল চোখের স্নেহ দিয়ে পথের ক্লান্তি দূর করে দিতে চায়। পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মহাকালের সাক্ষীস্বরূপ বিশাল অশ্বত্থ গাছগুলি যেন ছাতার মতই পথিকের মাথার উপর শোভিত।

সেই আলো-ছায়া, সেই উত্তাপ এবং প্রশান্তির পথ ধরে জননী

এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। নবযুগের পথে—যে পথের শুরু হয়েছে জয়রামবাটিতে।

মা ভবতারিণীর লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বরে এই প্রথম চলেছেন মা সারদামণি।

কিন্তু যিনি ভবিষ্যতের বিশ্বজননী, যিনি পরবর্তীকালের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্ঘজননী—সেদিন সেই প্রদোষকালে সেই তিনিই এক সাধারণ পল্লীরমণীর মত অন্য আর দশজন পল্লীবাসীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথম দু'দিন স্বামীসমীপে যাওয়ার উদ্দীপনায় এবং নতুন দেশ দেখার উন্মাদনায় কুসুম-কোমল চরণ ফেলে বেশ সহজেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এলেন তিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর যেন বিদ্রোহ করতে থাকে। পা যেন আর চলতে চায় না।

যে সময়ের প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়, সেই সময় বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চল ছিল ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অবাধ বিচরণভূমি। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার গ্রাস থেকে জয়রামবাটি গ্রামও মুক্ত ছিল না, মুক্তি পাননি মা সারদাও। দেবী হয়েও যিনি সাধারণ পল্লীবাংলার প্রতিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি তাঁর জীবনলীলায় সাধারণের রোগ-শোক-জ্বালা সব কিছুই বরণ করেছেন অক্লেশে।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ছিলেন দুর্বল। তার উপর এই দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রথম। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন তিনি। সবাই অভ্যস্ত পদক্ষেপে

এগিয়ে চলেছেন, সেই সমান তালে এগিয়ে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বড় দুর্বল লাগছে তাঁর। তবু মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারছেন না—কে কি ভাববে? পিতা রামচন্দ্র হয়ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন।

তাই সর্বংসহা ধরণীর প্রতিমূর্তি মা সারদাও সব কষ্ট নীরবে সহ্য করে এগিয়ে চলেছেন।

* * *

কিন্তু এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরই তিনি বুঝতে পারলেন, না, এভাবে আর চলা যাবে না। পা আর চলতে চায় না। দেহে উত্তাপ বাড়তে থাকে। তিনি অনুভব করলেন, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল দাপটে তাঁর দেহের উপর দখল কায়েম করেছে।

আর চলতে পারলেন না। তবু মুখ ফুটে বললেন না কিছুই। কিন্তু পিতা রামচন্দ্র কন্যার মুখের দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠলেন, সর্বনাশ, সারুর শরীর যে দারুণ খারাপ!

তাই পথ চলা বন্ধ হল। অন্যরা সবাই এগিয়ে গেলেন, থামার সময় নেই তাঁদের। শুধু কন্যাকে নিয়ে রামচন্দ্র গিয়ে আশ্রয় নিলেন একটি চটিতে। চটি বলতে পথের ধারে পথিকের আশ্রয়—যেখানে খাবার-দাবারও পাওয়া যেত।

চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন বটে, কিন্তু মা সারদার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল হতাশার অন্ধকার, পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর কাছে তখন বিস্বাদ। স্বামীর কাছে যাবেন বলে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই যাত্রায় এভাবে বিরতি ঘটল কেন?

তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।

* * *

অচেনা-অজানা জায়গা—সেখানেই প্রবল জ্বরে মা সারদা বেহুঁশ।

প্রবল জ্বরে মা তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত—কোনদিকেই তাঁর চোখ নেই, মনও নেই। শুধু ভাবছেন, কতদিনে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছবেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, তাঁরই পাশে একজন মহিলা এসে বসলেন।

কে এই মহিলা—তিনি চিনতে পারছেন না। কোনদিন দেখেছেন বলেও মনে পড়ে না।

সেই মহিলা যেন একান্ত আপনজনের মতই মায়ের পাশে বসে অপলক প্রসন্ন নয়নে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভালো, বয়সও বেশি নয়। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু টানা টানা বড় চোখ, অপরূপ মুখের গড়ন। এমন কালো, অথচ এমন সুন্দর মুখ তিনি আগে কোনদিন দেখেননি।

মেয়েটি কিছুক্ষণ মা সারদার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর মাথার উপর। প্রবল যন্ত্রণায় মাথার ভিতরে তখন তোলপাড় হচ্ছিল। সেই মেয়েটির কালোবরণ কোমল হাত কপালে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অনুভব করলেন এক পরম শান্তির স্পর্শ। দেহটা যেন জুড়িয়ে গেল, প্রাণে যেন ছুঁয়ে গেল আনন্দের স্রোত।

মা সারদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই অপরিচিতা মেয়েটির দিকে, তারপর শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কে? তুমি কোথা থেকে আসছ গা?"

প্রসন্নবদনা সেই কালো মেয়েটি বললেন, "আমি দক্ষিণেশ্বর থেকেই আসছি।"

"দক্ষিণেশ্বর থেকে?" মা সারদার কণ্ঠে বিস্ময়। সেই দক্ষিণেশ্বর যেখানে তাঁর জীবনধন বিরাজ করছেন! হঠাৎই সারদার নজর পড়ল মেয়েটির চরণযুগলের দিকে। ধূলায় ধূসর কালো চরণ দেখে মা আবার প্রশ্ন করলেন, "কি গো মা, কেউ কি পা ধুতে জল দেয়নি?"

মেয়েটি নিজের ধূলিমাখা পায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মা মা, আমি এক্ষুনি চলে যাব, তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে।"

একথা শুনে মা সারদা যেন আপন মনে বললেন, "আমি মনে করেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু দেহে এত জ্বর, আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হল না।"

মা সারদার কণ্ঠে বিষণ্ণ সুর। মেয়েটি যেন তাঁকে উৎসাহ দেওয়ার

জন্যই বললেন, "সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।"

এই আশ্বাসবাণী শুনে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে আবার যেন জলের রেখা চিক্‌চিক্ করে উঠল। তিনি বললেন, "বটে? তাই তুমি এসেছ?"

এরপর আর কিছুই মায়ের স্মরণে নেই। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মনে সেই অযাচিত আশ্বাসবাণীর ছোঁয়ায় অবসাদ অনেকটাই দূর হয়ে গেল। মা সারদা পরম প্রশান্তিতে সেই অজ্ঞাত স্থানে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

*　　　*　　　*

পরবর্তীকালে মা সারদার অশেষ করুণা এবং স্নেহ লাভ করে-ছিলেন যে স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ), তিনিই মাতৃ অনুধ্যানে লিখেছেন ('শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটি', পৃঃ ৩৫) : "শ্রীশ্রী-মায়ের দুইটি রূপ দেখা যাইত। একটি সাধারণ মানবীয় রূপ। এই অবস্থায় মা সাধারণ মেয়েদের মত সামাজিক সকল বিধিব্যবস্থাই মানিয়া চলিতেন। সাধারণ সংসারীর ন্যায় দুঃখ, কষ্ট, শোক তাপ সবই অনুভব করিতেন। অপরটি মায়ের অসাধারণ রূপ—সাধারণ রূপটির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিত। সংসারের সবই গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ইহা তাঁহার বাহ্যরূপ; সংসারের সব কোলাহলের মধ্যে তাঁহার মন ছিল সর্বদাই প্রশান্ত ও ঊর্ধ্বমুখী—সবই যেন বহু নিম্নে পড়িয়া আছে। সবকিছুর মধ্যে থাকিয়াও যেন তিনি কিছুতেই নাই। এইটিই মায়ের সত্যিকারের রূপ। ঐ স্বরূপের চেতনা যখন মায়ের মনে আসিত, মা তখন এমন এক স্তরে অবস্থান করিতেন যে, সে স্তর সাধারণের নাগালের বাইরে। এই অবস্থায় মা কেবল তাঁহার সন্তানদের মঙ্গল কামনা করিতেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ইহকাল পরকালের সর্ব কর্ম সংস্কার খণ্ডন করিয়া দিয়া ভগবানের পথে প্রেরণা দিতেন এবং ক্রমে শাশ্বত শান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন।"

"'জগদুদ্ধার:হেতু ত্বম্ অবতীর্ণা যুগে যুগে'—জগতের উদ্ধারের জন্য

তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন—এই কথার যথার্থতা মায়ের জীবনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত।"

মা সারদা বিশ্বজননী হয়েও নিজের স্বরূপটি সযত্নে মায়ার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তাই তাঁকে কি আর সবাই চিনতে পারে? চিনতে পেরেছিল?

যাঁরা চেনার মত শক্তিধর—তাঁরাই শুধু চিনেছিলেন। চিনেছিলেন বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি তাঁর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে এক চিঠিতে লিখলেন, "দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সব সময়ে বলি, 'কো রামঃ'? ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন, "স্বামীজী যখনই মায়ের বাড়িতে যেতেন, পূর্ব থেকেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন। একদিন ভোরে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বার বার ডুব দিতে লাগলেন, যেন কিছুতেই দেহের পবিত্রতা আনতে পারছেন না। শেষে যদিও বা উঠলেন, সেবককে বললেন, ওরে আমার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে। কোনরকমে মায়ের ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েছেন, আর চলতে পারলেন না, ভাবে বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মা তাড়াতাড়ি এসে নরেনকে তুলে ধরলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।"

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে নৌকায় চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ মাকে দর্শন করতে। স্বামীজী বারবার গঙ্গাজল পান করছেন দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "এত ঘোলা জল খেয়ো না, সর্দি হবে যে।" উত্তরে স্বামীজী বললেন, "না ভাই, বড় ভয় করে। আমাদের তো মন—মার কাছে যাচ্ছি, বড় ভয় করে।"

স্বামী প্রেমানন্দ, যিনি বাবুরাম মহারাজ বলেও পরিচিত, একটা চিঠিতে লিখেছেন, "শ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নেই তাঁর। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মা'র বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত

লুপ্ত। এ কি মহা শক্তি! জয় মা! জয় মা! জয় মা! জয় শক্তিময়ী মা! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মায়ের কাছে চালান করে দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস্, স্বয়ং ঠাকুরকেও এটা করতে দেখিনি, তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই ক'রে লোক নিতেন। আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখছিস্? অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা! মা! জয় মা!!

* * *

এ সবই তো অনেক পরের অনুভব, অনেক পরের উপলব্ধি। কিন্তু যে সারদামণি নিতান্তই একজন গ্রাম্য রমণীর মত সহস্র দুঃখকষ্ট বরণ ক'রে নিয়ে পতিসন্দর্শনে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে, সেই সারদাই যখন বালিকা, তখনও তাঁর জীবনে ভাবীকালের সেই বিশ্বজননী রূপটি যেন বারবার প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সেবার জয়রামবাটী অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। গ্রামের পর গ্রামে একমুঠো অন্নের জন্য মানুষ হাহাকার করছে। সর্বত্রই অভাব, সর্বত্রই ক্ষুধা, সর্বত্রই হাহাকার। সকলেই যেখানে দুর্ভিক্ষের শিকার—সেখানে কে কাকে রক্ষা করবে?

একমুঠো অন্ন আর একটু ভালোবাসার কাঙাল শত শত মানুষ ছুটে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আকাশের আগুনে মাঠ জ্বলছে, মাঠের ফসল মাঠেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ হয়ে উঠেছে চরম স্বার্থপর—সবাই নিজে বাঁচতে চায়, অপরের জন্য কেউ ভাবে না।

এই সর্বনাশা ক্ষুধার আগুন যখন চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিন্তু ইতিকর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব করলেন না। ঘরে যতটা ফসল আছে, যতটুকু আছে, তাই দিয়ে ক্ষুধার্ত নারায়ণের সেবা করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন তিনি।

স্বামীর এই সেবাব্রতে হাত লাগালেন সারদা-জননীও। তিনিও

লেগে গেলেন কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধতে। মায়ের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে চলেছেন বালিকা সারদাও।

এখানে একটা কথা স্মরণে রাখতে হবে। মা সারদার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, বিত্তবান ছিলেন না। তবু তিনি নিজের বা নিজের সংসারের ভবিষ্যৎ-চিন্তা না করেই ক্ষুধিত নিরন্ন মানুষের সেবায় নিজের সবটুকু সম্পদ উজাড় করে দিলেন।

খবর ছড়িয়ে গেল গ্রামে গ্রামে, জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়িতে খাবার পাওয়া যাচ্ছে। খবর যেমনি ছড়িয়ে গেল, তেমনি ভিড়ও এসে সমবেত হল। ক্ষুধার্ত মানুষের পাতে গরম গরম খিচুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সেই গরম খিচুড়ি মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এতে অনেকেরই হাত পুড়ছে, বা মুখ পুড়ছে।

মানুষের এই দহনজ্বালা, অসহায় মানুষের এই জীবন-যন্ত্রণা দেখে দূরে সরে থাকতে পারলেন না বালিকা সারদা। কেউ তাঁকে বলে দেয়নি, কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয়নি—কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি ভালবাসার পবিত্র স্পর্শে মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তুলতেই জয়রামবাটির শক্তিপীঠে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি গোড়া থেকেই জানতেন, "ভালবাসাই তো আমাদের আসল, এটাই সর্বস্ব।"

তাই তিনি নিজেই তালপাতার পাখা হাতে নিয়ে সেই নিরন্ন মানুষের সামনে এগিয়ে গেলেন। নিজের ছোট ছোট হাত দিয়ে পাখা চালিয়ে একই সঙ্গে গরম খিচুড়ি এবং তাপিত মানুষকে শান্তি দিলেন, শান্ত করলেন এবং জুড়িয়ে দিলেন। তিনি যেন প্রাণঢালা ভালবাসার ঐশ্বর্যকে ধারণ করেই বলতেন, "সকলে সুখী হোক, কেউ যেন দুঃখ না পায়, সকলে মুক্ত হয়ে যাক।"

* * *

আবার আমরা ফিরে যাই সেই চটিতে।

ভাবীকালে যিনি লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননী—সেই সারদামণি সেদিন সেই মাতৃত্বের মহিমায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্যই যেন এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরের পথে। একটা সাধারণ চটিতে ম্যালেরিয়া রোগে

আক্রান্তা হয়ে যিনি দারুণ দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিয়েই শান্বিতা—সেই মা সারদার জন্যই দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরও যেন সেদিন অপেক্ষমান।

তাই দেখা গেল, পরদিন সকালেই মা সারদার শরীরে জ্বর আর নেই। আগের দিন রাত্রে ঘোরকৃষ্ণবর্ণা সেই মেয়েটির দর্শন পাওয়ায় ফলে তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাসও নতুন করে ফিরে এসেছে, প্রাণে-মনে দেখা দিয়েছে উৎসাহও। তিনি যেন অনেকটা শক্তিও ফিরে পেয়েছেন।

সকালের স্নিগ্ধ আলোয় তিনি উঠে বসলেন। রামচন্দ্রও মেয়ের এই উন্নতি দেখে আশান্বিত হয়ে উঠলেন। এই অজানা-অচেনা জায়গায় মেয়েকে নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে তিনি আর আদৌ ইচ্ছুক নন।

তাই রামচন্দ্র বলবেন কি বলবেন না ভাবতে ভাবতে কথাটা মেয়েকে বলেই ফেললেন, "এই বিদেশে নিরুপায় হয়ে পড়ে থাকার চাইতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়াই ভালো। তাই না মা?"

পিতার এ কথায় মা সারদাও সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, "সেই ভালো।"

তাঁরা আবার পথে নামলেন। পিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে আবার মা সারদা চলতে শুরু করলেন।

শরীর বড়ই দুর্বল, পথও ভালো নয়—তবু তিনি পা ফেলছেন। দক্ষিণেশ্বরে তো যেতেই হবে। সেখানেই তো তিনি অপেক্ষা করে আছেন। অপেক্ষা করে আছে ভাবীকালের নতুন ইতিহাস, নবজাগরণের ইতিবৃত্ত।

* * *

এই অবসরে আমরা জননী সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপনীত হওয়ার কিছুদিন আগে সংঘটিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘটনাবলী সম্পর্কে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" অনুসরণে কিছুটা জেনে নিতে পারি।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস তখনও জীবিত আছেন—যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর-জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন।

সেই সময় একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে মথুরবাবুকে বললেন,

"মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকবে, আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকব!"

মথুরবাবু এ কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কারণ তিনি জানতেন সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীর ধারণ করে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সর্বসময় রক্ষা করে চলেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সেদিন ওই কথা শুনেই তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করে চলে যাবেন।

আতঙ্কিত স্বরে কাতরভাবে তিনি বললেন, "সে কি বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে খুব ভক্তি করে।"

মথুরবাবুর এই অস্থিরতা দেখে পরমপ্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন, বললেন, "আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি (পুত্র) যতদিন থাকবে, আমিও ততদিন থাকব।"

পরবর্তী ঘটনাতেও আমরা দেখি মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা দাসী এবং পুত্র দ্বারকানাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের জন্য দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করেছিলেন।

সে যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরবাবুর জীবন ও মনে যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের শাস্ত্র বলে, মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তাঁর সকল শুভকর্মজাত ফলের অধিকারী হন। সেটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে অবতার পুরুষের সেবকেরা যে দৈবী সম্পদের অধিকারী হবে, তা আর এমন বেশি কথা কি?

সেটা ১৮৭১ সালের জুলাই মাস।

পরমভক্ত মথুরবাবু হঠাৎই একদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। সেই জ্বর আর সারে না। কত চিকিৎসা, কত ব্যবস্থা—কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হবার নয়। হলও না। একটানা সাত-আটদিন এরকম চলার পর মথুরবাবুর কথা বলার শক্তিও আর রইল না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁর কণ্ঠ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, জগন্মাতা তাঁর ভক্তকে নিজের স্নেহশীতল কোলে ধারণ করতে চলেছেন। মথুরবাবুর অপার ভক্তিব্রত যথার্থই

উদ্‌ঘাপিত হয়েছে। তিনি ভাগ্নে হৃদয়কে পাঠাতেন, "যা একবার মথুরকে দেখে আয়।"

একবার নয়, বারবার পাঠাতেন। কিন্তু নিজে একদিনও গেলেন না। এও যেন এক বিচিত্র লীলা।

ধীরে ধীরে চরম মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। সেদিন ১৬ জুলাই। অন্তিম সময়ে পুণ্যসলিলা আদিগঙ্গার তীরে কালিতীর্থ কালীঘাটে মথুরবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল।

এমনই আশ্চর্য, প্রতিদিন যিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে হৃদয়কে পাঠাতেন মথুরকে দেখার জন্যে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের সেই দিন কিন্তু একবারের জন্যও হৃদয়কে পাঠালেন না। সকাল থেকেই কেমন যেন আনমনা তিনি, আষাঢ় মাসের সেই বর্ষণক্লান্ত দিনে কেমন যেন আত্মমগ্ন তিনি।

ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়ে এল। বিকেল হয় হয়। সেই দিনান্তের প্রসন্ন আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এক পরম জ্যোতির সমুদ্রে গভীর-ভাবে নিমগ্ন হলেন। দেখতে দেখতে তিন ঘণ্টা কেটে গেল—তিনি বাহ্যজ্ঞানহারা এক অপরূপ মূর্তি। এ জগতে দেহটা পড়ে আছে—কিন্তু তিনি চলে গেছেন অন্য জগতে, দূরে—বহু দূরে—আরও কত কত দূরে। অসীমের জ্যোতির্মণ্ডলে।

তখন বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যেন ফিরে এলেন এই জগতে। ভাব ভঙ্গ হল তাঁর। ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে হৃদয়কে ডাকলেন তিনি।

হৃদয় এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বগত সংলাপের মতই যেন বললেন, "শ্রীশ্রী জগদম্বার সখীরা মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠিয়ে নিলেন—তার তেজ শ্রীশ্রী দেবীলোকে চলে গেল।"

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই মহাপ্রস্থানের দৃশ্যটি।

সেদিনই বেশি রাত্রে দক্ষিণেশ্বর যখন শান্ত সমাহিত, তখন মন্দিরের কর্মচারীরা শোকার্ত চিত্তে কলকাতা থেকে ফিরে এসে হৃদয়কে

সেই দুঃসংবাদ দিলেন : মথুরবাবু আর নেই। তিনি চিরদিনের জন্য চলে গেছেন।

কিন্তু সব থেকে বিস্ময়ের সংবাদ হচ্ছে এই যে, মথুরবাবুর সেই মহাপ্রস্থানের সময় ছিল বিকেল পাঁচটা। সেই সময়—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনন্তলোকের পথে শেষযাত্রার সেই শেষ চলমান ছবি।

মথুরবাবু বিদায় নেওয়ায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বুকে পরিবর্তনের সম্ভাবনাই যেন সূচিত হল।

* * *

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই মা সারদা চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

রুগ্ন শরীরের বোঝা বহন করেই মা এগিয়ে চলেছেন পথে। দুর্বল শরীর, কিন্তু সবল মন—সেই মনের জোরেই তিনি হেঁটে চলেছেন। কিছুদূর যেতেই বরাতজোরে একটা পালকি পাওয়া গেল। সেটা একদিক থেকে রক্ষে।

কারণ, একটু পরেই আবার গা কাঁপিয়ে জ্বর এল মা সারদার শরীরে। এবার জ্বর তেমন কষ্টদায়ক ছিল না। তাছাড়া পালকি পেয়ে যাওয়ায় পথ চলার অনিশ্চয়তাও ছিল কম।

তাই তিনি জ্বরের কথা গোপন করেই রাখলেন। পিতা জানলে পাছে আবার উতলা হয়ে পড়েন।

তারকেশ্বরের পর কৈকালার মাঠ পার হয়ে অবশেষে তাঁরা এলেন বৈদ্যবাটিতে। এই বৈদ্যবাটি থেকেই নৌকায় যাবেন দক্ষিণেশ্বরে। পুণ্যসলিলা গঙ্গা নদীতে বিকেলেই নৌকা ভাসল।

রাত তখন প্রায় ন'টা। নৌকা এসে ভিড়ল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঘাটে।

তক্ষণে মন্দিরের ভিতরেও খবর পৌঁছে গেছে : জয়রামবাটি থেকে ওঁরা এসেছেন।

* * *

সেই স্বপ্নের দক্ষিণেশ্বরে, সেই রাত্রির অন্ধকারে, সেই মা

ভবতারিণীর দরজায়, সেই প্রথম এসে উপনীত হলেন মা সারদামণি। হঠাৎ তাঁর কানে এল শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর স্বর—যা শোনার জন্য তাঁর প্রাণ এতটা পথ গভীর আগ্রহে হয়ে ছিল উন্মুখ।

মা সারদা শুনতে পেলেন, ঠাকুর বলছেন, "ও হৃদু, বারবেলা নাই তো রে? প্রথমবার আসছে।" হৃদু মানে হৃদয়কে বলছেন তিনি—কেমন স্নেহমাখা স্বর, কেমন প্রেমঘন উদ্বেগ।

মা সারদা জানতেন, বারবেলা কেটে গেছে। তিনি গঙ্গার উপর নৌকাতেই বারবেলা কাটিয়ে এসেছেন। গঙ্গার ঘাট থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে।

সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউ পেলেন নহবতে ঠাঁই, আবার কেউ বা নিলেন গিয়ে অন্যত্র ঠাঁই।

* * *

সেদিন সেই নিশীথ অন্ধকারে দুরুদুরু বক্ষে এবং এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে মা সারদা গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে।

জয়রামবাটিতে থাকতে কত কি শুনেছেন লোকের মুখে। চার বছর ধরে সহ্য করেছেন কত মানসিক যন্ত্রণা। আজ তাই এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা তাঁর সঙ্গী: ঠাকুর কি সত্যি পাগল?

মা সারদাকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমময় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, চোখে-মুখে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল আনন্দরেখা। তাঁর সেই উজ্জ্বল ভাব অস্পষ্ট অন্ধকারেও ঢাকা পড়ল না।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন পত্নীর দিকে, বললেন, "তুমি এসেছ? বেশ করেছ।"

অবগুণ্ঠনবতী মা স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর শুনে হয়ে পড়েন বাক্যহারা। অবনত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

মায়ের দিকে আরেকবার চোখ মেলে তাকান ঠাকুর। তারপরই সেখানে উপস্থিত আরেকজন ভক্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কই, মাদুর পেতে দে রে।"

মাদুর পাতা হল। মা গিয়ে আসন নিলেন সেই মাদুরে।

সারদার মনে গত চার বছরের কত কথা জমে আছে, জমে আছে কত অভিমান। জয়রামবাটি গ্রামে কত লোকনিন্দা শুনেছেন, শুনেছেন কত পতিনিন্দা—সেই সব যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতাই নীরবে বহন করে এনেছেন তিনি।

কিন্তু যার জন্য এত কথা, যাকে নিয়ে এত কথা, তাঁর সামনে এসে এক লহমায় হারিয়ে গেল সব মান অভিমান, সব অভিযোগ অনুযোগ। তিনি তখন বাক্যহারা।

শুধু ঠাকুরের সেই দিব্যজ্যোতি মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, "এই কি পাগলের লক্ষণ? তাহলে এমন মানুষকে পাগল বলে যারা চালায়, তারা আসলে কি?"

ধীরে ধীরে মা সারদা যেন সহজ হয়ে ওঠেন মুখ তোলেন তিনি, মুখও খোলেন।

আর অবগুণ্ঠনবতীর সেই সলাজ কণ্ঠস্বর মন দিয়ে শোনেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কথায় কথায় ঠাকুর শুনলেন মায়ের অসুস্থতার কথা, শুনলেন, অবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত মা নিদারুণ পীড়িতা।

অসুস্থতার কথা শুনেই উতলা হয়ে পড়েন শ্রীরামকৃষ্ণ। মা সারদার চিকিৎসা ও সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে গিয়েই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন তিনি।

আজ আর কি সেদিন আছে? তাই শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসিক উৎকণ্ঠা। বার বার তাঁর শুধু মনে হতে থাকে তাঁরই "রসদদার" মথুরবাবুর কথা। মথুরবাবু নেই—তাই ঠাকুরও হয়ে পড়লেন বিব্রত।

মায়ের দিকে তাকিয়ে বার বার তিনি বলতে থাকেন, "তুমি এতদিনে এলে! এখন কি আর আমার সেজোবাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে? আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে।"

মা এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে একদিন যে মহামিলন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে তাই এই সুযোগে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি শুধু সে যুগের অশেষ পুণ্যবতী এবং দানশীলা জমিদার হিসেবেই বিখ্যাত ছিলেন না, দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে বিরাজ করছেন।

জানবাজারের "মাড়-বংশের" প্রীতরাম দাস অল্পস্বল্প ইংরেজি জানতেন এবং সেই বিদ্যাকে সম্বল করেই ফোর্ট উইলিয়ামে ইংরেজ সৈন্যদের খাবার-দাবার সরবরাহের ব্যবসায় অঢেল অর্থের মালিক হন। এই প্রীতরামই আবার পূর্ববঙ্গের এক মহাজনের সঙ্গে যৌথভাবে বেলেঘাটায় বাঁশের এক আড়ত খোলেন।

বাঁশ যখন নদীপথে ভাসিয়ে আনা হয় তখন একত্রে অনেকগুলি বাঁশ বেঁধে জলে ভাসানো হয়—একেই বলে "মাড়"। প্রীতরাম "মাড়ের" ব্যবসা করতেন বলেই তিনি স্বয়ং এবং তাঁর বংশধররা জনসাধারণের কাছে "মাড়" নামেই পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রীতরামের দুই পুত্র—হরচন্দ্র এবং রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় গঙ্গাতীরবর্তী বিখ্যাত জনপদ হালিসহরের সন্নিহিত কোনা গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা রাসমণির। দরিদ্র হরেকৃষ্ণ ছিলেন মাহিষ্য।

তাই এমন বিবাহ ছিল এক অভাবিত ঘটনা। বিয়ের তারিখ ছিল বাংলা ১২২১ সালের ৮ই বৈশাখ। অন্য দিকে রাজচন্দ্র যথার্থই রাজকীয় চন্দ্রশোভিত পুরুষ ছিলেন—যাঁর দান-ধ্যান সে যুগ থেকে শুরু ক'রে আজও কিংবদন্তি হয়েই আছে।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই সুযোগ্য পত্নী এবং অশেষ পুণ্যবতী রানী রাসমণি বিশাল জমিদারী পরিচালনার দায়-দায়িত্ব এবং গুরুভার গ্রহণ করেন।

রানী রাসমণির ব্যক্তিত্ব যেমন সে যুগের পক্ষে বিস্ময়, তেমনি তাঁর ধর্মকর্ম এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেও চিহ্নিত।

রানীর মনের গহনে অনেকদিন ধরেই বাসনা ছিল যে, কাশীধামে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন এবং মা অন্নপূর্ণাকে পূজা দেবেন। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে সে বাসনা পূর্ণ হওয়ার মত সুযোগ আর তিনি পাননি।

স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারী পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব একা একা বহন করতে গিয়ে তিনি হিমসিম খেয়েছেন, সেই সঙ্গে পালন করতে হয়েছে তাঁকে যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান। এরই মধ্যে জামাতা মথুরা-মোহন জমিদারির কাজকর্মে রানীর পাশে এসে দাঁড়ানোয় তিনি কিছুটা শান্তি এবং স্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

এবার তাহলে কাশী যাওয়া যেতে পারে—ভাবলেন তিনি। ১৮৪৭ সালে (বাংলা ১২৫৫ সন) তিনি ঠিক করলেন কাশী যাবেনই।

তখনকার দিনে কাশী যাব বললেই আজকের মত যাওয়া যেত না। নদীপথে যাওয়া ছাড়া ভিন্ন কোন উপায়ও ছিল না। তা না হলে পায়ে হেঁটে যেতে হত। তখনও রেলপথ হয়নি।

রানী রাসমণি কাশী যাবেন—এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে চেনা-জানা অনেকেই এসে হাজির রাসমণির কাছে। সবাই কাশী যেতে চান—এমন সুযোগ কি আর সহজে পাওয়া যাবে ?

রানী কাউকেই ফেরাতে পারলেন না। সবাই যাবে, সবই প্রস্তুত

হল। পঁচিশখানি বড় বড় বজরা নৌকা প্রস্তুত হল, আর সেইসব নৌকায় এত তীর্থযাত্রী এবং মাঝি-মাল্লাদের জন্য ছয় মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য মজুত করা হল। সে এক এলাহি ব্যাপার!

চার কন্যার মাতা রাসমণি যখন স্বামীকে হারান, তখন তাঁর বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" স্বামী সারদানন্দজী রানী রাসমণির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন (দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী, পৃঃ ৬৮): "অশেষ গুণশালিনী রানী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতি রাসমণি দাসী।' ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রানীর দেবভক্তি ঐ-রূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।"

রানী যখন কাশী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সেই সময় তাঁর চার কন্যারই বিবাহ হয়ে গেছে। শুধু তৃতীয় কন্যার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়দর্শন ও ধর্মপ্রবণ জামাতা মথুরামোহনকে চতুর্থ কন্যা জগদম্বা দাসীর সঙ্গে বিবাহ দেন।

আসলে মথুরামোহনের উপর অপুত্রক রানীর ভরসা ছিল সমধিক। তাই সেই প্রিয় জামাতা মৃত কন্যার অবর্তমানে যাতে দূরে সরে না যায়, সেইজন্যই চতুর্থ কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ। হয়তো এটাও ছিল বিধাতারই অভিপ্রায় এবং রামকৃষ্ণলীলার অনিবার্য পরিণতি।

রানী পরদিন সকালেই মা কালীকে স্মরণ করে কাশী যাত্রা করবেন—সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, স্পষ্ট দেখলেন, স্বয়ং দেবী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি স্পষ্ট শুনলেন, দেবী তাঁকে বলছেন, "কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাগীরথীতীরে সুন্দর পরিবেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, আমি ওই মূর্তির আশ্রয়েই আবির্ভূতা হয়ে তোমার কাছ থেকে নিত্য পূজা গ্রহণ করব।"

অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন মতও আছে। সেই মত অনুসারে রানী যথা-বিহিত কাশী যাত্রা করেন ঠিকই, কিন্তু কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার পর তিনি যখন নৌকায় রাত্রিবাস করছিলেন তখনই তিনি ঘুমের ঘোরে দেবীর ওই একই স্বপ্নাদেশ লাভ করেন।

সে যাই হোক, দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানী কাশী যাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করেন। তাঁর তখন একমাত্র ধ্যান জ্ঞান স্বপ্নাদেশ অনুসারে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। মন্দিরের জন্য সেই সুন্দর স্থানটি খুঁজে বার করা।

প্রচলিত প্রবাদ, গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল। তাই রানীরও মনোবাসনা, বারাণসী যখন যাওয়াই হল না, তখন গঙ্গার পশ্চিম কূলেই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

রানীর একান্ত বিশ্বস্ত মথুরামোহনের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হল। রানীর ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য পুত্রতুল্য জামাতা গঙ্গার পশ্চিমকূলে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে গিয়ে উপযুক্ত জমির সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু কোথায় জমি? জমি যে নেই, তা নয়, কিন্তু সেইসব জমির মালিকরা জমি বেচতে রাজি নয়।

সেই সময় বালি উত্তরপাড়া অঞ্চলে "দশ-আনি" এবং "ছ'-আনি" জমিদারীর মালিক জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল খুবই জোরদার। তাঁদের অহংকার ছিল, গঙ্গায় যাওয়া-আসার পথে তাঁরা নিজেদের জমির উপর দিয়েই যাতায়াত করেন, অন্যের জমিতে পা ফেলেন না। রানী রাসমণি প্রচলিত দামের চাইতে বেশি দাম দিয়ে ওই অঞ্চলে গঙ্গার ধারে জমি কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখনকার জমিদাররা নিজেদের অহংকার বিসর্জন দিয়ে জমি বিক্রি করতে রাজি হলেন না।

এও এক বিচিত্র লীলা। রানী রাসমণি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েও সেদিন দেবী-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য গঙ্গার পশ্চিমকূলে জমি পান নি। তাই একান্ত নিরুপায় ও বাধ্য হয়েই গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে স্বপ্নাদিষ্ট মন্দির স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করেন।

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন, তখন তিনি চেয়েছিলেন গঙ্গার পূর্বকূলেই জমি। কারণ এই পূর্বকূলেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ও সিদ্ধি লাভ করেন এবং এখান থেকেই তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষকে উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন, "আয়, আয়, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।"

কিন্তু সেদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বকূলে সামান্য একখণ্ড জমিও পেলেন না। অথচ তিনি জমি পেলেন গঙ্গার পশ্চিমকূলে। পূর্বদিগন্তে উত্থিত মহাবাণী যেন পশ্চিমদিগন্তে গিয়ে উদ্ভাসিত ও বিচ্ছুরিত হল।

লক্ষ্য করার বিষয়, পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের নামে আত্মসমর্পিতা সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা গঠিত এদেশের প্রথম স্ত্রীমঠ সারদা মঠ ও মিশন যখন মূল কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি খুঁজছিলেন, তখন তাঁরা কিন্তু পূর্বকূলেই গঙ্গাতীরে জমি পেয়েছিলেন—যেখানে আজ স্থাপিত হয়েছে সারদা মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র।

সম্ভবত গঙ্গার পূর্বকূল, তথা দক্ষিণেশ্বর মাতৃমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তাই, মহিয়সী রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। সেখানেই শেষ নয়। মন্দিরে পূজিতা হন মা ভবতারিণী—যাঁর সাধনা এবং আরাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মূল মন্দিরের যে অঙ্গন, তার বাইরে প্রতিষ্ঠিত নহবৎখানা, যেখানে প্রথমে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণজননী, পরে এসে যুক্ত হলেন জননী সারদামণি।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন যেন মাতৃত্বের সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং নারীত্বের মধ্যে দেবীত্বের বোধন ঘটাতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন।

*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানী রাসমণি যেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন করলেন—সেই স্থানটিও যেন নানা কারণেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। এই স্থানটির এক দিকে কলকাতার তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ এটর্নি জেমস হেস্টি সাহেবের কুঠি ছিল। অন্য দিকে

ছিল মুসলিমদের কবরডাঙ্গা এবং গাজিসাহেবের পীরের 'থান' (স্থান)।

১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রানী রাসমণি ওখানকার ষাট বিঘা জমি হেস্তি সাহেবের কাছ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় কেনেন। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ভবিষ্যতে যেখান থেকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাবাণী উচ্চারিত হবে, সেই স্থানটি প্রথম থেকেই ক্ষেত্র হিসেবে সেই মহাবাণীর উপযুক্ত স্থান রূপেই যেন চিহ্নিত।

শুধু তাই নয়, অন্ধ-অবিশ্বাসের যুগে যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সাধন-মাহাত্ম্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের মতই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করেন, সেই ভূমিখণ্ডও যেন সেই দুশ্চর সাধনারই উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্থানটি ছিল কচ্ছপের পিঠের মতই। তন্ত্রশাস্ত্রমতে, এরকম স্থানই দেবী প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি-সাধনার জন্য উপযুক্ত।

* * *

সাড়ে তিনশ' বছরের ব্যবধানে দুই অবতারের অবতরণ। ভগবান শ্রীচৈতন্য এবং অবতরবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দুই মহাজীবনের মধ্যে এমন কতকগুলি আশ্চর্য মিল দেখা যায়—যা কিনা পূর্বনির্ধারিত বলেই মনে হয়।

শ্রীচৈতন্যের সাধনভূমি যে নবদ্বীপ—সেই নবদ্বীপও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। নবদ্বীপের প্রচলিত ধ্যান থেকে জানা যায়, এই জনপদও প্রসারিত হয়েছে কচ্ছপের পিঠের মতই আকৃতিসম্পন্ন এক ভূমিখণ্ডের উপর (কূর্ম পৃষ্ঠা ভগাত্রং)। ওই জনপদও ছিল নানারকমের ফুল ও ফলের গাছে শোভিত।

একই ভাবে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ এই দক্ষিণেশ্বরও গঙ্গানদীর তীরে। এখানকার ভূমিভাগও প্রথম দিকে কচ্ছপের পিঠের মতই ছিল, পরে সমতল করা হয়। এখানেও ছিল নানারকম ফল ও ও ফুলের গাছ।

এমন উপযুক্ত স্থানে মন্দির নির্মিত হওয়ায় এবং মা ভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণও আনন্দিত হন। তিনি বলতেন: "রানী যেন দৈবাধীন হয়েই ওই স্থানটি মন্দির তৈরির জন্য ঠিক করেন।"

*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণদিকে ছিল ইংরেজ কোম্পানির বারুদ-খানা। উত্তরে ছিল যদুনাথ মল্লিকের বাগান এবং পূর্বে গঙ্গা। গঙ্গার ধারেই যেহেতু মন্দির তৈরি হবে, সেইজন্য প্রথমেই গঙ্গার পাড় বাঁধানো হল, তৈরি হল ঘাট। তা না হলে নদীর উত্তাল তরঙ্গ মন্দিরের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। প্রবল বানের আঘাতে নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করে।

এর পরই রানী রাসমণি গঙ্গার ঘাট তৈরি এবং পাড় বাঁধাবার কাজ দিলেন মেকিনটশ কোম্পানিকে। এজন্য সে যুগে খরচ হয়েছিল এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। এই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরই মন্দির তৈরির কাজে হাত লাগানো হয়।

মন্দির তৈরি করতে দশ বছর সময় লেগেছিল। মন্দিরের সামনে বিশাল চাতাল। সেই চাতালের পূর্বদিকে চাঁদনি। আর ওই চাঁদনির দুই দিকে ছয়টি ছয়টি করে দ্বাদশ শিবমন্দির। দক্ষিণ দিকে পর পর যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর (বা নন্দিকেশ্বর) ও নরেশ্বর শিবলিঙ্গ মন্দির আলো করে বিরাজ করছেন। আর উত্তর দিকের ছয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর।

শিবমন্দিরগুলিতে সাদা ও কালো পাথর দিয়ে তৈরি বেদির উপর কালো পাথরের শিবলিঙ্গ শোভা পাচ্ছেন। আর শিবলিঙ্গের পূর্বদিকে বিদ্যমান মহাদেবের বাহন বৃষভ—যা তৈরি করা হয়েছে কালো পাথর দিয়েই। সোপকরণ সামান্ন নৈবেদ্যোপচারে দ্বাদশ শিবের নিত্যপূজা ও সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা আছে। শিবরাত্রির দিন লক্ষ ভক্তের সমাগমে দ্বাদশ শিবের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এবার মন্দিরের অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গানদীর সমান্তরালে ৪৪০ ফুট লম্বা এবং ২২০ ফুট চওড়া টালির আঙিনা। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আর এই আঙিনার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রয়েছে একতলা

দালান এবং প্রত্যেকে প্রান্তের মধ্যস্থলে বড় বড় ফটক। আঙিনার ঠিক পূর্বদিকে নয়টি চূড়া-বিশিষ্ট মা ভবতারিণীর মন্দির এবং তারই ঠিক উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। ভবতারিণী-মন্দিরের নয়টি চূড়া তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথম স্তরে চারটি চূড়া এবং চারটির মধ্যে পূর্ব-দক্ষিণ কোণের চূড়াটি একসময় ঝড়ে বেঁকে গিয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে চারটি চূড়া এবং শেষ স্তরে একটি।

একবার এই ভবতারিণী-মন্দিরের উপর বাজ পড়েছিল এবং তাতে মন্দিরের কিছু কিছু ক্ষতি হলেও দেবীমূর্তি ছিল অক্ষত। তারপরই বাজ প্রতিরোধক লোহার দণ্ড মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে বসানো হয়েছে।

বাংলা ১২৬২ সনেও মন্দির তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। এই ঘটনায় রানী রাসমণি রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতে থাকেন, মানুষের জীবন যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি অনিশ্চিত—কখন আছে কখন নেই, কেউ জানে না। যদি মন্দির সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি মারা যান, তাহলে তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ ই থেকে যাবে।

তাই তিনি আর দেরি না করে বাংলা ১২৬২ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, স্নানযাত্রার দিনে মন্দিরে মা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" স্বামী সারদানন্দ বলেছেন (সাধকভাব পৃঃ ৭৯): "শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্বাহে রানী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রানী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন। মন্দির ও দেবমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভদিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।"

"এমন সময় যে কোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং

রানীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।"

এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পরই রানী হয়ে উঠলেন অধীরা। আর তিনি অপেক্ষা করতে রাজি নন্। মা জগদম্বা তাঁরই আশ্রয়ে এসে কষ্টে আছেন—একথা ভেবেই রানী রাসমণি বিচলিত হয়ে উঠলেন।

তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন নির্ধারণ করার জন্য পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হলেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুভদিনে তিনি দেবী প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু স্নানযাত্রার পূর্ণিমা তিথির আগে অন্য কোন শুভ দিন পাওয়া গেল না। তাই ওই স্নানযাত্রার দিনই শুভকাজের জন্য নির্দিষ্ট হল। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

* * *

ভবতারিণী মন্দিরের দক্ষিণে বিরাট নাটমন্দির—যেখানে এখন প্রতিদিন সহস্র ভক্তজন এসে মিলিত হন, মুক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয় শ্যামাসঙ্গীত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি। এই নাটমন্দিরের ছাদ ষোলটি থামের উপর সংস্থাপিত। ১২৭০ সনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে মথুরানাথ এখানে অন্নমেরুর অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই নাটমন্দিরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসমক্ষে ভৈরবী পূজার আয়োজনও করেছিলেন।

নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গনে বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এখানে অমাবস্যায় একটি ছাগবলি হয় এবং কালীপূজার রাত্রে একাধিক বলির ব্যবস্থা হয়।

আগেই বলেছি, কালীমন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির—যেখানে কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত ত্রিভঙ্গ রাধাকান্ত বামে অষ্টধাতুর তৈরি নিস্তারিণীকে নিয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে বিরাজিত। অষ্টধাতুর তৈরি গোপাল ও গরুড় মূর্তি যথাক্রমে রাধাকান্তের সামনে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাজমান।

এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পূজকের পদে নিযুক্ত হন বাংলা ১২৬৩ সনে (ইংরেজি ১৮৫৭-৫৮)। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজার ভার গ্রহণ করেন।

মন্দিরের উত্তরদ্বারের পূর্বদিকে অতিথিশালা, এছাড়া আছে দু'টি নহবৎখানা। দপ্তরখানার দক্ষিণে একটি নহবৎখানা—যেখান থেকে পূজার সময় সুমধুর বাদ্যধ্বনি প্রচারিত হত। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ঘরের উত্তরে আর একটি নহবৎখানা—যেখানে ঠাকুরের জননী গঙ্গালাভের আগে পর্যন্ত বাস করেন। আর মা সারদা বাস করেন তের বছর।

মন্দিরের পূর্বদিকে একটা পুকুর আছে। ওই পুকুরের বাঁধানো ঘাটের পাশেই গাজীতলা। আর ওই কুঠিবাড়ির উত্তরদিকে যে পুকুর আছে—তার নাম হাঁসপুকুর। সম্ভবত, ওই পুকুরে হাঁস চড়ে বেড়াত।

এখন যেখানে পঞ্চবটী—আগে সেখানে একটি আমলকি গাছ ছিল, আর ছিল কিছুটা জঙ্গল। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই আমলকি গাছের নিচে বসেই সন্ধ্যার পর ধ্যান করতেন। পরে আমলকি গাছের পাশে অশ্বত্থ, অশোক, বেল ও বটগাছ রোপণ করে তিনি স্বহস্তে তাঁর সাধনা-ক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছিলেন।

পঞ্চবটী তলা ইট দিয়ে বাঁধানো এবং গোলাকার বেদি, এই বেদির উত্তর-পশ্চিমদিকে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি অনুসারে নরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, কুকুরের মুণ্ড, ষাঁড়ের মুণ্ড এবং শেয়ালের মুণ্ড দিয়ে পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি হয়। আবার যোগিনীতন্ত্র অনুসারে শুধু পাঁচটি নরমুণ্ড দিয়েও পঞ্চমুণ্ড আসন তৈরি করা যায়।

এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ নানা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পঞ্চবটীর পূর্ব দিকে একটি পর্ণ কুটির তৈরি করা হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাই চেয়েছিলেন। তিনি নিজে যেমন ওই কুটিরে বসে সাধনা করতেন, তেমনি ত্যাগী সন্তানদেরও বলতেন ওখানে বসে সাধনা করতে, এখন সেই কুটিরটি পাকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে।

পঞ্চবটীতে যেমন তোতাপুরী এসে আসন পেতেছিলেন, তেমনি বেলতলায় এসে ১৮৬১ সালে আসন পেতেছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব কোণে এই বেলতলা। এখানেও তিনটি নরমুণ্ডের সমাহারে ত্রিমুণ্ডী আসন তৈরি করে ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভয়ঙ্কর কঠিন সাধনপথে পরিচালিত করেন।

আবার মা সারদার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার আগে আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী-টাও একটু জেনে নিতে চাই। কারণ, যে মহাতীর্থে জননী সারদা এলেন, সেই তীর্থভূমির আদিকাণ্ডটিও এক্ষেত্রে অনিবার্য কারণেই প্রাসঙ্গিক।

মন্দিরের পরিচয় যেমন ইতিমধ্যেই আমরা পেলাম, এবার তেমনি পাব মন্দিরের অতীত কাহিনী।

পুণ্যবতী রানী রাসমণি ভবতারিণী মন্দিরের জন্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি রেখে গেছেন, সেকালেই তার বার্ষিক আয় ছিল ৬৫ হাজার টাকা। অবশ্য এর মধ্যে সরকারি খাজনা দিতে হত ২২ হাজার টাকা, রোডশেশ ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ ধরা ছিল চার হাজার টাকা। এইসব খরচ বাদ দিয়েও বছরে আয় হত ৩৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে মন্দিরের জন্য ব্যয় হত ১২ হাজার টাকা।

পরবর্তীকালে দেশভাগের ফলে রানী রাসমণির বিরাট জমিদারির একটা বড় অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে যায়। তাছাড়া জমিদারি প্রথাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে আয় আর আগের মত নেই।

* * *

রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার আগেই মা জগদম্বাকে অন্নভোগ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি যে জাতিতে কৈবর্ত্য, এই নির্মম সত্যকেও অস্বীকার করতে পারলেন না।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে" স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, "রানী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার

প্রাণতো একবারও বলে না যে, অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—হৃদয় তো ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখনও সঙ্কুচিত হয় না। তবে এই বিপরীত প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শাস্ত্রকার কি প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন?…তিনি অন্নভোগ প্রদানের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সকল আনাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন না।…পণ্ডিতগণের নিকট বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাহার আশা যখন ঐ বিষয়ে প্রায় নির্মূলিতা হইয়াছিল, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্বে রানী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্র-নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।" ("দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী" অধ্যায়, পৃঃ ৭১-৭২)

এই বিধান পাওয়ার পরই রানী নিজের গুরুদেবের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তত্ত্বধায়ক হিসেবে নিজের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

অবশ্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বিধান দিলেন, পণ্ডিতরা সরাসরি সেটাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না ঠিকই, কিন্তু কৌশলে প্রচার চালাতে লাগলেন, "ওই' মন্দিরে ব্রাহ্মণরা প্রসাদ গ্রহণ করবেন না।"

অন্যদিকে এরকম ব্যবস্থা দান করে উদারতার পরিচয় দেওয়াতে রামকুমারের প্রতি রানীর শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল। তাই তিনি শুধুমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র-বিধানের মধ্যেই রামকুমারের সঙ্গে সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ না রেখে সেটাকে আরও প্রসারিত, সম্ভব হলে স্থায়ী করতে উদ্যত হলেন।

ওদিকে একটা সমস্যা মিটলেও আরেকটা সমস্যা তখনও মেটেনি। মন্দিরের পূজক হবেন কে? দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার মহাভার কে গ্রহণ ও বহন করবেন?

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" অনুসরণে জানতে পারি, এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা রানীর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াল। শূদ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদেবীর পূজা করা দূরে থাক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ সেকালে প্রণাম পর্যন্ত করে ঐ সব মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করতেন না।... সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রানীর দেবালয়ে পূজক-পদে ব্রতী হতে সহসা রাজি হলেন না। এতে কিন্তু রাণী হতাশ না হয়ে বেতন ও পারিতোষিকের হার বাড়িয়ে দিয়ে পূজকের জন্য নানাস্থানে সন্ধান করতে লাগলেন।

* * *

কামারপুকুরের কাছেই সিহড় গ্রাম—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বোন হেমাঙ্গিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। ওই গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রানী রাসমণির কর্মচারী ছিলেন। ইনি হাতেনাতে কিছু নগদ প্রাপ্তির আশায় মন্দিরের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ যোগাড় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অন্য ব্রাহ্মণরা যাতে এর মধ্যে কোন মতলবের ছায়া দেখতে না পায়, তার জন্য তিনি নিজের বড়ভাই ক্ষেত্রনাথকে রাধা-গোবিন্দের পূজারী পদে নিযুক্ত করেন।

মহেশচন্দ্র আগে থেকেই রামকুমারকে জানতেন এবং চিনতেন। তিনিই রানীকে বললেন, "আপনি রামকুমারকে পূজক পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করুন।" ইতিমধ্যে রামকুমার সম্পর্কে রানীর খুব ভালো ধারণা তৈরি হওয়ার কারণও ঘটেছে। তাই রানী লিখলেন,—

"শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থা বলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভ মুহূর্তে ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদ গ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে

তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।”

এই পত্রটি নিয়ে মহেশচন্দ্র নিজেই গিয়ে হাজির হলেন ঝামাপুকুরে রামকুমারের কাছে। কিন্তু নির্লোভ রামকুমার রানী রাসমণির অনুরোধ রাখতে রাজি হলেন না কিছুতেই।

শেষ পর্যন্ত মহেশচন্দ্র ভিন্ন পথ ধরলেন। তিনি রামকুমারকে বোঝালেন: ঠিক আছে, আপনাকে স্থায়ীভাবে পূজকের পদ গ্রহণ করতে হবে না। তবে যতদিন না একজন উপযুক্ত পূজক পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন আপনি পূজকের কাজটা চালিয়ে দিন।

এই প্রস্তাবে নিতান্ত অনিচ্ছুক রামকুমারও অবশেষে রাজি হলেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণও পাওয়া যায়।

কামারপুকুরের কাছেই দেশড়া নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের রামধন ঘোষ রানীর জমিদারিতে চাকরি করতেন এবং নিজের কর্মদক্ষতায় তিনি রানীর বিশেষ কৃপাভাজন হন। তিনি ‘দেওয়ান’ পদও লাভ করেছিলেন। ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় রামধন ঘোষ নিজের দেশের এবং আগে থেকেই পরিচিত রামকুমারকে বিদায় নিতে আসতে অনুরোধ করে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্র পাওয়ার পর রামকুমার এসে উপস্থিত হন জানবাজারে রানীর বাড়িতে। রামধনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে রামকুমার খোলাখুলি জানিয়ে দেন, “রানী রাসমণি কৈবর্তজাতীয়া, আমরা তাঁর দান বা নিমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করি, তাহলে সমাজে একঘরে হতে হবে।”

একথা শুনে রামধন কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে একটা খাতা নিয়ে এলেন। তিনি সেই খাতাটা খুলে রামকুমারকে দেখিয়ে বললেন, “তুমি যে একঘরে হওয়ার কথা বলছ, এই দেখ, কত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। নিমন্ত্রিতরা সকলেই অন্ন গ্রহণ করবেন এবং রানীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন।”

সবকিছু দেখেশুনে রামকুমারও কিছুটা নরম হলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশচন্দ্র এবং রামধনের অনুরোধেই তিনি পূজকের পদ গ্রহণ করতে রাজি হন।

*　　　　*　　　　*

মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট বসেছিল। বসেছিল পরমানন্দের মেলা। আলোকমালায় গোটা মন্দিরাঙ্গন অপরূপ চেহারা ধারণ করেছিল, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে পুঞ্জীভূত বহুযুগের অন্ধকার সেই আলোকপ্রভায় বিদূরিত হয়েছিল। নতুন আলো বিচ্ছুরিত হওয়ার ইঙ্গিত সেদিন সেই সন্ধ্যায়ই যেন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল।

একদিকে দিব্য আলোকের অভিসার, অন্যদিকে রামায়ণ গান, কালী কীর্তন, ভাগবত পাঠ এবং যাত্রার আসরে আনন্দের অভিষেক।

সেদিন রাত্রে সেই আনন্দযজ্ঞে যোগ দিতে এসেছিলেন কামার-পুকুরের সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রামকুমার। আর তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সত্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই প্রথম তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

সেদিনের সেই উৎসবের কথা স্মরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ওই সময় দেবালয় দেখে মনে হয়েছিল, রানী যেন রজতগিরি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছেন।"

*　　　　*　　　　*

পরদিন ছিল ১২৬২ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ। পুণ্য স্নানযাত্রার দিন।

দূরদূরান্ত থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এসেছেন এই মহোৎসবে যোগ দিতে। উষালগ্নের ব্রাহ্মমুহূর্তে নহবৎখানা থেকে ভেসে এলো পবিত্র সুরধ্বনি। মন্দির প্রাঙ্গণ মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হল।

বহুদূরের কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ওড়িশা, নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিত প্রধান স্থান থেকে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে সমবেত হয়েছেন। রানী তাঁদের প্রত্যেককে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপ একটি করে স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিয়েছিলেন।

রামকুমার কি সেদিন মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করেননি? এ সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রামকুমার ওই দিন সিধা নিয়ে গঙ্গাতীরে নিজে রান্না করে অভীষ্টদেবীকে নিবেদন

করেন। তারপর সেই প্রসাদ তিনি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, মন্দিরের প্রসাদ তিনি গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু এই বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত? রামকুমারের মত একজন সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কি এটা সম্ভব? তিনি নিজে যেখানে বিধান দিয়ে দেবীর অন্নভোগের ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজেই সেই ভোগ নিবেদন করেছেন। যেখানে তাঁর পক্ষে সেই প্রসাদ গ্রহণ করার অসুবিধা ছিল কোথায়?

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে" স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "আমাদিগের ধারণা, তিনি (রামকুমার) পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিন্তু ওই আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয় নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপূর্বক সন্ধ্যাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।"

পরদিন ভোর হতে না হতেই পায়ে হেঁটে ঝামাপুকুর থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়ে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে। অগ্রজ রামকুমারের খবরাখবর নেওয়ার জন্যই এই অধীরতা। তাছাড়া মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহও ছিল তাঁর।

মন্দিরে এসে দেখেন, রামকুমার খুবই ব্যস্ত। যেভাবে তিনি নতুন এই দেবালয়ের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, তাতে তাঁর পক্ষে সেদিনও ঝামাপুকুরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, এদিনও তাঁকে একাই ঝামাপুকুরে ফিরে যেতে হবে।

রামকুমার অবশ্য তাকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরেই থাকতে বললেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তাতে সায় নেই। দাদার অনুরোধ এড়িয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার আগেই তিনি ঝামাপুকুরে ফিরে যান। আসলে, মন্দিরে তিনি অন্নগ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না।

* * *

সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরে আসার পর চার-পাঁচদিন কেটে গেল—

শ্রীরামকৃষ্ণ আর দক্ষিণেশ্বরে গেলেন না।

তাঁর মনও যেন সেখানে যেতে রাজি নয়। মনে মনে তিনি ভাবলেন, অগ্রজ রামকুমার নিশ্চিত ভাবেই আর দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। তাঁর কাজ তো এতদিনে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ, তিনি তো শুধুমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতেই সেখানে গেছেন—স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার তো কোন প্রশ্ন নেই।

এ ভাবেই এক সপ্তাহ কেটে গেল। রামকুমার ঝামাপুকুরে ফিরলেন না। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ নানারকম দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে পড়লেন।

তাই আবার তিনি গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি যে সংবাদ শুনলেন, তাতে তিনি রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। রামকুমার নাকি স্থায়ীভাবে এই মন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। রানী রাসমনির ইচ্ছাই ফলবতী হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্নচিত্তে গিয়ে দেখা করলেন রামকুমারের সঙ্গে, জানতে চাইলেন আসল ঘটনা। শুনলেন, তিনি চিরকালের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবক হতে রাজি হয়েছেন।

কিন্তু সত্যাশ্রয়ী পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অশূদ্রযাজিত্বের কথা, তা কি রামকুমার বিস্মৃত হয়েছেন? বিস্মৃত হয়েছেন কি পিতার অপ্রতি-গ্রাহিত্বের কথাও? শ্রীরামকৃষ্ণ নিতান্ত নিরুপায় হয়েই অগ্রজকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, পিতার কথা মনে রেখেই তাঁর এখান থেকে চলে আসা উচিত।

অন্যদিকে রামকুমার শান্তচিত্তে নানা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝালেন, রানীর যজন-যাজন গ্রহণ করলে কোন অপরাধ হয় না, হয়ও নি। কিন্তু এসব নীরস শাস্ত্রবাক্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি, পারেনি অন্তরে কোন রেখাপাত করতেও।

তখন নিরুপায় রামকুমার ধর্মপত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই ধর্মপত্রানুষ্ঠান ব্যাপারটা কি? সেকালে পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত প্রথা ছিল, যদি কোন ধর্মীয় বা সামাজিক বিতর্ক বা বিষয় যুক্তিসহ

শাস্ত্রবাক্যে মীমাংসিত না হয়, যদি সকল পক্ষ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একমত হতে না পারেন, তখন তাঁরা দৈবকে মেনে নিয়ে এই ধর্মপত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন।

কতকগুলি কাগজের টুকরোয় 'হাঁ' এবং কতকগুলি টুকরোয় 'না' লিখে একটা ঘটির মধ্যে রেখে দেওয়া হত। তারপর একটি সরলমতি শিশুকে দিয়ে ঘটি থেকে একটি কাগজের টুকরো তোলানো হত। শিশুটি যে কাগজের টুকরোটি তুলতো, তাতে যদি 'না' লেখা থাকে, তবে সবাই বুঝতেন, এ ব্যাপারে দেবতার সায় নেই। আবার 'হাঁ' তুললে সবাই মেনে নিতেন যে এটাই দেবতার নির্দেশ।

কেউ বলবেন সংস্কার, কেউ বলবেন কুসংস্কার—যে যাই বলুন না কেন, বিশ্বাসের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এই ধর্মপত্রানুষ্ঠান সেকালে অনেক সমস্যার সমাধানে সহায়ক হত।

এমনকি বিষয় সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি সুফল প্রসব করত। কোন পিতার সন্তানদের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে গ্রামের প্রধান পুরুষরা সেই সম্পত্তিকে পুত্রদের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করে প্রতিটি ভাগের তালিকা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখে দিতেন। তারপর একজন পুত্রের নাম ধরে এক একজন শিশু একটি করে কাগজ তুলত ঘটি থেকে। তাতে যার ভাগ্যে যা উঠত, তাকে সেটাই মেনে নিতে হত।

আজকাল কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমা হয় এবং বিষয় সম্পত্তির মামলা বছরের পর বছর চলে, তবু মীমাংসা হয় না। ন্যায়বিচার অযথা কালহরণের ফলে অবিচারেই পরিণত হয়। তার চাইতে সেকালের এই পদ্ধতি অনেক বেশি সহজ এবং গ্রহনীয় ছিল।

সে যাই হোক, রামকুমার যে ধর্মপত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাতে যে কাগজটি তোলা হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল: "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণ করে কোনপ্রকার নিন্দিত কাজ করেন নি। এতে সকলের মঙ্গল হবে।"

ধর্মপত্রের এই মীমাংসার পর শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে আর কিছুই

বলা সম্ভব ছিলনা, বলেন নি তিনি কিছুই। তিনিও মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু তখন তাঁর মাথায় এক চিন্তা, "দাদা যদি স্থায়ীভাবে পূজকের পদ গ্রহণ করেনই, তাহলে ঝামাপুকুরের টোল চালাবেন কে? টোল যদি বন্ধ হয়েই যায়, তাহলে তিনি নিজে থাকবেন কোথায়?"

চিন্তা করছেন তিনি, কিন্তু সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত সেদিন আর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝামাপুকুরে ফিরে গেলেন না। ফিরে যাওয়ার আর কোন উৎসাহও ছিল না তাঁর। টোলতো উঠেই যাবে—তিনি তখন এই ভাবনায় অস্থির। চঞ্চল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেলেন। বেলা গড়িয়ে দুপুর হয় হয়। রামকুমার ছোট ভাইকে বললেন: দুপুরবেলা মন্দিরেই প্রসাদ পাবে।

তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোর আপত্তি।

রামকুমার অনেক করে তাঁকে বললেন, "এটা দেবালয়। দেবতার ভোগ গঙ্গাজলে রান্না করা হয়। তাছাড়া সবকিছুই মা জগদম্বাকে নিবেদন করা হয়েছে। এই প্রসাদ গ্রহণে কোন দোষ হবে না।"

কিন্তু কে কার কথা শোনেন? রামকুমারের কোন কথাই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে ধরলো না, যদিও কানে ঢুকেছিল সবই।

এও এক বিচিত্র খেলা। মানুষের শরীর ধারণ করে এবার যে অবতার এলেন, তিনি মানুষের সকল অসম্পূর্ণতাকে অতি সহজেই স্বীকার করে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেইসব অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে তিনিই সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য এক নতুন আদর্শের পথ দেখালেন।

যিনি রানী রাসমণির মন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণেও ছিলেন অরাজি, তিনিই সেই মন্দিরে শুধু পূজকের পদ গ্রহণ নয়, সর্বধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলেন। যিনি এই মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণেও সেদিন ছিলেন অরাজি, তিনিই পরবর্তীকালে স্বহস্তে সেই প্রসাদই শুধু নিজে নন, মা জগদম্বার মুখে তুলে দিয়েছেন।

আসলে সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনে যে সব প্রশ্ন প্রথমেই

উত্থাপিত হতে পারে, তিনি স্বয়ং সেগুলি উত্থাপন করে তারপর একদিন সংস্কারমুক্ত অসাধারণ মানুষের মত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সংশয়াচ্ছন্ন মানুষ খুঁজে পেয়েছে সংশয় মুক্তির রাজপথ, দিব্যজীবন বহনের মহারথ।

*　　　　*　　　　*

রামকুমার যখন দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুতেই মন্দিরের প্রসাদও গ্রহণ করবেন না, তখন তিনি অসহায় ভাবে বললেন, "বেশ, তাহলে তোমাকে সিধা (চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি) দিচ্ছি, তুমি গঙ্গাতীরে গিয়ে নিজে রান্না করে খাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গঙ্গা ছিল সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি। তাই গঙ্গাতীরে বসে রান্না করে খাবেন—এই প্রস্তাবে এককথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

রামকুমারের অশেষ শাস্ত্রজ্ঞান এবং ক্ষুরধার যুক্তি যাঁকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি, শুধুমাত্র গঙ্গা নাম স্মরণেই তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন।

তারপর থেকেই শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পবিত্র গঙ্গাতীরে বসে স্বহস্তে রান্না করে অন্ন গ্রহণ এবং দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। শৈলসুতা ভাগীরথী তীরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কামারপুকুরের সেই সদানন্দময় জীবনের স্বাদ ফিরে পেতে শুরু করলেন। পিতৃতুল্য অগ্রজের প্রেম-প্রীতি যেমন তাঁর কাছে ছিল পরম সম্পদ, তেমনি দেবদ্বিজ পরায়ণ পুণ্যবতী রানী রাসমণি এবং তাঁর সুদর্শন জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল।

এভাবেই প্রায় একমাস কেটে গেল।

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর সংসারে সদানন্দেই আছেন। অথচ মথুরবাবু এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে চান না, তিনি চান এই পাগল ঠাকুরও মন্দিরের কাজে যুক্ত হোক। শ্রীরামকৃষ্ণকে যতই দেখেন

ততই যেন তিনি ওই পাগল ঠাকুরের মধ্যে এক দিব্য পুরুষের সন্ধান পান।

তাই তিনি মনে ঠিক করলেন, ঠাকুরকে মা জগদম্বার বেশকারী পদে নিযুক্ত করবেন। অপরূপ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমূর্তিকে প্রতিদিন নতুন নতুন সাজে সাজাবেন—এই মথুরবাবুর বাসনা।

সেই বাসনার কথা একদিন রামকুমারকেও বললেন তিনি। কিন্তু রামকুমার তাতে মত দিতে পারলেন না। মথুরবাবুকে বুঝিয়ে বললেন, নিজের ভাইয়ের যাবতীয় মতিগতির কথা। কিন্তু সব কিছু শুনেও মথুরবাবু পিছু হঠতে নারাজ। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখেছেন এক নতুন মানুষকে।

* * *

সেই সময়েই দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন ঠাকুরের পিসতুতো বোনের ছেলে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—সম্পর্কে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয়।

দীর্ঘাকৃতি, সুঠাম গঠন এবং সুপুরুষ হৃদয়রাম একটা চাকরির সন্ধানে বর্ধমান শহরে গিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সের হৃদয় বর্ধমানে কিছুদিন থেকেছিলেন পরিচিত জন ও পরিজনের বাড়িতে—কিন্তু তাতে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বর্ধমানেই তিনি গ্রাম সম্পর্কে পরিচিত একজনের মুখে শোনেন, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি যে বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে হৃদয়রামের দুই মামা সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণেশ্বরে গেলে কিছু সুরাহা হতে পারে।

এই খবর পেয়ে হৃদয়রাম আর কালহরণ না করে সটান চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সম্ভবত, এটাও ছিল বিধিরই বিধান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপর্বে হৃদয়রামের মত একজন মানুষেরই যে প্রয়োজন ছিল—সেটা আজ আর অজানা নয়।

দক্ষিণেশ্বরে আসার পর ধীরে ধীরে হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ছোট মামার ভাব জমে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সবে বিশ বছর পেরিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, শোওয়া ইত্যাদি সকল কাজেই সকাল থেকে সন্ধ্যে

পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গে।

হৃদয়রাম যে সময়ের কথা বলছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব : পৃঃ ৯০) :

এই সময় থেকে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচণীয় আকর্ষণ অনুভব করতাম ও ছায়ার মতই সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতাম। তাঁকে ছেড়ে একদণ্ড কোথাও থাকতে হলে কষ্টবোধ হত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করতাম। কেবল মধ্যাহ্ন ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের পৃথক হতে হত। কারণ, ঠাকুর সিধা নিয়ে পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করে খেতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পেতাম। তাঁর রন্ধনাদির সমস্ত জোগাড় আমি করে দিয়ে যেতাম এবং অনেক সময় প্রসাদও পেতাম।···মধ্যাহ্নে ঐরূপ রান্না করলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদের মত শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খেতেন।

*　　　　*　　　　*

হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে আসার পর থেকেই সব সময় ঠাকুরের সঙ্গে ছায়ার মত থাকতেন। ছোট মামার প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল একটু বেশি। ছোটমামাও যে হৃদয়কে খুবই ভালোবাসেন—সেটা বুঝতেও তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। এত সবকিছুর মধ্যেও শুধু একটা ব্যাপার হৃদয় কিছুতেই বুঝতে পারতেন না।

বড় মামা রামকুমারকে যখন হৃদয়রাম কোন কাজে সাহায্য করতে যেতেন, কিংবা দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন একটু শুয়ে থাকতেন, অথবা, সন্ধ্যায় যখন তিনি মন্দিরে আরতি দেখতে যেতেন—ঠিক সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতেন। হৃদয়কে এড়িয়ে কোথায় যেন তিনি আত্মগোপন করতেন। হৃদয় তাঁকে ছেড়ে অন্য কাজে গেলেই তিনিও ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যেতেন।

ছোটমামা যে কোথায় যান—সে প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেও পাননি। তিনি অনেক সময়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজিও করেছেন। কিন্তু শত খুঁজেও

তাঁকে কখনও দেখতে পেতেন না। কিন্তু কোথায় যেতেন তিনি? হৃদয় শুধু ভাবতেন।

কয়েকঘণ্টা বাদে আবার যথারীতি ফিরে আসতেন তিনি। একরোখা হৃদয়ও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি একজন বয়স্ক অভিভাবকের মতই ছোটমামাকে প্রশ্ন করতেন: এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

—"এখানেই তো ছিলাম"। পরম পুরুষের সুধামাখা কণ্ঠের সহজ সরল উত্তর। সেই প্রসন্ন হাসি। সেই অন্তরঙ্গ ভাব। কিন্তু এই উত্তরে হৃদয়রাম খুশি হতে পারতেন না।

এ ভাবেই চলছিল। এরই মধ্যে একদিন মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লোক পাঠালেন। সেই লোক এসে সবিনয়ে জানাল: বাবু আপনাকে ডাকছেন।

একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবান্তর হৃদয়ের তীক্ষ্ণ নজর এড়ালো না। তিনি অবাকই হলেন। মথুরবাবু যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন সেখানে তাঁর আমন্ত্রণে তাঁরই কাছে যেতে ঠাকুর এতটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন? হৃদয়রাম শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানতে চাইলেন তাঁর ছোট মামার কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই আপন মনে বললেন: মথুরবাবু কেন ডাকছেন, আমি জানি।

—কেন? হৃদয়রাম আবার জানতে চান।

—মথুরবাবুর কাছে গেলেই তিনি আমাকে এখানে থাকতে বলবেন। এখানে চাকরি নিতে বলবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দেন।

—তাতে দোষ কি? এমন জায়গায় মহতের আশ্রয়ে কাজে নিযুক্ত হওয়াতো ভালো। এরমধ্যে খারাপ কি আছে যার জন্য তুমি এতটা বিচলিত? হৃদয়রাম আবার বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—চাকরি করার আমার ইচ্ছে নেই। চাকরিতে আবদ্ধ থাকতেও আমি রাজি নই। তাছাড়া দেবীর অঙ্গে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার আছে।

এখানে চাকরি নিলে, সে সবের দায়িত্বও আমার উপর এসে পড়বে। এ বড় হাঙ্গামার ব্যাপার, এসব আমি পারবনা। আপন মনেই কথাগুলি বলে যান শ্রীরামকৃষ্ণ।

তারপর এক সময় হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তবে যদি তুমি ওই কাজের ভার নিয়ে এখানে থাক, তাহলে পূজা করতে আমার আপত্তি নেই।"

হৃদয়রাম তো এতদিন বলি বলি করেও সেই কথাটাই বলতে পারছিলেন না, এবার স্বয়ং মা জগদম্বাই সেই সুযোগ এনে দিলেন। তিনিতো চাকরির আশায়ই এখানে এসেছেন। তাই এক কথাতেই তিনি রাজি। দক্ষিণেশ্বর লীলাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণের একজন লীলাসহচর এসে যুক্ত হলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই এইসব ঘটনা পর পর ঘটে গেল।

*　　　*　　　*

ইংরেজি ১৮৫০ সালে রামকুমার কলকাতায় এসে টোল খুলেছিলেন। আর ১৮৫৩ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কলকাতায় আসেন। তারপর থেকে তিনি ঝামাপুকুর টোলেই থাকতেন। তারপর ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি এবং সেই বছরই (বাংলা ১২৬২ সন) তিনি কালীবাড়ির পূজক পদে নিযুক্ত হন। তাঁর দাদা রামকুমারের সঙ্গে থেকেই এই কাজের সূচনা। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে রামকুমার দেহত্যাগ করেন। তারপর থেকেই শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারলীলার অভিষেক পর্ব।

*　　　*　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কালীবাড়িতে আসার পর থেকে একটানা চৌদ্দ বছর মথুরবাবুই ছিলেন তাঁর "রসদদার"। কিন্তু ১৮৭১ সালে মথুরবাবুও অনন্তলোকে যাত্রা করেন—যে কাহিনী আমরা আগেই বর্ণনা করেছি।

মথুরবাবুর পর তাঁর স্ত্রী জগদম্বা প্রায় সাতবছর মন্দিরের সেবায়েৎ ছিলেন। জগদম্বার মৃত্যুর পর সেবায়েতের দায়িত্ব ভার অর্পিত হল

তাঁর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের হাতে। ইনিও প্রায় ত্রিশ বছর সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করেন।

সে সব ভিন্ন কাহিনী। এখানে শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পূজক পদ গ্রহণের প্রায় সতের বছর পরে ইংরেজি ১৮৭২ সালে (বাংলা ১২৭৮ সন) জননী সারদা প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তিনি না এলে লীলাঙ্গন পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত না। তাঁরই জন্য যেন দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস ফুল ফল সবাই অপেক্ষা করেছিল।

*　　　　*　　　　*

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে শুধু জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা এখানেই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয় ইংরেজি ১৮৩৬ সালে, বাংলা ১২৪২ সনে ৬ ফাল্গুন ব্রাহ্মমুহূর্তে। আর জননী সারদাদেবীর আবির্ভাব হয় ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর (বাংলা ১২৬০ সন, ৮ পৌষ)। বয়সের ব্যবধান প্রায় ১৮ বছর। বিবাহ হয় ১৮৫৯ সালের মে মাসে (বাংলা ১২৬৬ সনের বৈশাখ)। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৪ বছর। সারদাদেবী প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন তাঁর পার্থিব বয়স মাত্র ১৮ বছর।

এবার আমরা আবার ফিরে আসি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে।

সুদীর্ঘ চার বছর অদর্শনের পর দক্ষিণেশ্বরে এসে স্বীয় পতিকে দর্শন করে জননী সারদা বুঝলেন: জয়রামবাটিতে এতকাল যা শুনেছেন সব ভুল, সব মিথ্যা। ইনি তো সেই আগের মানুষ, সেই দিব্যপুরুষ।

কথাবার্তা শেষ করে মা সারদা উঠে দাঁড়ালেন—অন্য সকলের সঙ্গে তিনিও থাকবেন নহবতেই।

বাধা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বললেন, "না, তা হয় না। তুমি এখানেই থাক। নহবতে থাকলে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। তুমি এ ঘরেই থাক।"

মা সারদা আর আপত্তি করতে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেই মায়ের জন্য পাতা হল আলাদা বিছানা। আর মায়ের সঙ্গে থাকার জন্য জয়রামবাটি থেকে আসা একজন সঙ্গিনীকেও ডেকে আনা হল। দুজনে একসঙ্গে এ ঘরেই থাকবেন।

এদিকে রাত হয়েছে অনেক। ঠাকুর দুশ্চিন্তায় পড়লেন, এতজন মানুষের জন্য কী খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি। তখন কালীবাড়ির সকলেরই খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেছে। মুস্কিল-আসান করলেন হৃদয়রাম। সেই রাত্রে তিনি কোথা থেকে তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এসে হাজির। সেই মুড়ি খেয়েই সকলে পরম তৃপ্তিতে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন।

* * *

পরদিন সকালেই শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার আনালেন।

অসুস্থা মা সারদাকে ডাক্তার এসে দেখলেন। চিকিৎসারও যাবতীয় ব্যবস্থা হল।

তিন-চারদিন একটানা ওষুধ-পথ্যের ফলে মা যেন বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে তিনি যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটল।

তবু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই এক আক্ষেপ: আজ আর সেজবাবু বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে আরও কত ভালো ব্যবস্থা হত। কত ভালো চিকিৎসা হত।

শেষ পর্যন্ত মা সারদা সুস্থ হয়ে সেই নহবত ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ছোট্ট একটা ঘর—একজন মানুষই টানটান হয়ে শুতে পারেন না—সেখানে একসঙ্গে কয়েকজন গিয়ে ঠাঁই নিলেন। এও এক

কঠিন তপস্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণি দেবী শেষ জীবনে গঙ্গার তীরে বসে জীবনপাত করার বাসনায় তখন দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। তিনিও থাকেন ওই নহবতেই।

অবশ্য দক্ষিণেশ্বরে আসার পর প্রথম দিকে চন্দ্রমণি দেবী কুঠিবাড়ীর একটি ঘরেই থাকতেন। মথুরবাবু সেই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটায় চন্দ্রমণি দেবী কুঠিবাড়ির সেই ঘর পরিত্যাগ করে এসে নহবতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

* * *

রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্ম হওয়ার পরই তাঁর স্ত্রী দেহত্যাগ করেন। তখন রামকুমারের বয়স ছিল ৪৪ এবং স্ত্রীর বয়স ৩৬। মাতৃহারা অক্ষয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহের পাত্র।

তাই দক্ষিণেশ্বরে আসার পর ঠাকুর অক্ষয়কেও নিজের কাছে এনে রাখেন। তখন অক্ষয়ও কুঠিবাড়ির একটা ঘরেই থাকতেন। পরে চন্দ্রমণি দেবীও সেই ঘরেই এসে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ অকালে আকস্মিক ভাবে অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মর্মাহত হয়ে পড়লেন, তেমনি চন্দ্রমণি দেবীও হয়ে পড়লেন শোকাহত। কুঠিবাড়ির ওই ঘরটির মধ্যে অক্ষয়ের স্মৃতি এমনই জীবন্ত ছিল যে, সেটা চন্দ্রমণি দেবীর পক্ষে সহ্য করা ছিল কঠিন।

তাই তিনি বললেন, "আর আমি ওখানে থাকব না। আমি এই নহবতের ঘরেই থাকব, গঙ্গাপানে মুখ করে থাকতে চাই। ওই কুঠিতে আর দরকার নেই।" তিনি কুঠিবাড়ি ছেড়ে নহবতে উঠে এলেন।

সেই নহবতে এতদিন পরে পুত্রবধূ সারদা এসে আশ্রয় নিলেন। তুলে নিলেন তাঁর সেবার দায়িত্ব।

* * *

দক্ষিণেশ্বরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে মা সারদা যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

কত সংশয় এবং আশংকা নিয়ে এসেছিলেন—যদি তিনি তাঁকে ভুলে

গিয়ে থাকেন। কিন্তু দেখলেন, সব কিছু ঠিকই আছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা অবারিত ধারায় গঙ্গার মতই প্রবাহিত।

* * *

অক্ষয়ের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাটি যেন পূর্বনির্দিষ্ট প্রস্তুতিরই ফল। এ যেন এক অনিবার্য নিয়তি। আপাত অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এ ব্যাপারে একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

আচার্য তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছুদিন পরেই বাংলা ১২৭২ সনের প্রথম দিকে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তিনি এসেই বিষ্ণুমন্দিরে পূজার ভার গ্রহণ এবং বহন করেন।

সতের বছর বয়সে অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল সুঠাম এবং সুললিত। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতেন, "দেখলেই মনে হয় যেন জীবন্ত শিব-মূর্তি এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

বাংলা ১২৫৯ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন, তখন অক্ষয়ের বয়স চার বছর। প্রথম থেকেই মাতৃহীন এই শিশুটির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ছিল অবিরাম।

অথচ স্বীয় পুত্রের প্রতি রামকুমারের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়নি। এ ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন তুললেই তিনি বলতেন: "মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? এ ছেলে বাঁচবে না।"

শিশুকাল থেকেই শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অক্ষয়ের একটু বেশী মাত্রায় পক্ষপাতিত্ব ছিল।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা রঘুবীরের সেবায় তাঁর আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ছিল অসাধারণ। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত—অক্ষয় আত্মমগ্ন হয়ে রঘুবীরের পুজো করে চলেছেন, এমন অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র বিরল ছিল না।

দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয় যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পুজো করতেন, তখন সব মানুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আরাধনা দেখতেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলেছেন: শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীর পুজো করতে বসে অক্ষয় ধ্যানে এমনই তন্ময় হত যে, ঐ সময়

বিষ্ণুঘরে বহু লোকের সমাগম হলেও সে জানতে পারত না। একটানা দুই ঘণ্টাকাল এভাবে কেটে যাওয়ার পর তাঁর হুঁশ হত।

সাধনপীঠে আরেকজন সাধক এসে আসন নিলেন।

বিষ্ণুমন্দিরে পুজো শেষ করেই অক্ষয় সোজা চলে যেতেন পঞ্চবটী-তলে। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে তিনি আপনমনে শিবপুজো করতেন। তারপর গঙ্গাতীরে নিজের হাতে রান্না করে নিজের ক্ষুধা দূর করতেন।

এ ভাবেই বাংলা ১২৭৫ সনের আধাআধি পার হয়ে গেল।

অক্ষয়ের খুল্লতাত রামেশ্বর ইতিমধ্যে মাতৃহারা যুবকটিকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে উঠে-পড়ে লাগলেন। শুরু হল উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান। শেষ পর্যন্ত কামারপুকুরের কাছেই কুচেকেলি নামের এক গ্রামে রামেশ্বর নিজের পছন্দমত পাত্রী পেলেন।

পাত্রী যখন মনের মতই পাওয়া গেছে, তখন শুভকাজে আর বিলম্ব কেন?

তাই রামেশ্বর এলেন দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়কে নিয়ে যেতে। তখন চৈত্র মাস। অনেকেই আপত্তি তুললেন, চৈত্র মাসে স্থানান্তর করা অশুভ। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

শেষ পর্যন্ত সকল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করেই অক্ষয়কে নিয়ে রামেশ্বর চৈত্র মাসেই কামারপুকুরে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর বাংলা ১২৭৬ সনের বৈশাখে অক্ষয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অক্ষয় অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে অসুখটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। খবর পেয়ে রামেশ্বর নিজেই উদ্যোগী হয়ে অক্ষয়কে কামারপুকুরে নিয়ে এলেন। চিকিৎসার যাবতীয় বন্দোবস্ত করলেন। অক্ষয়ও দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠলেন। শুধু সুস্থ নয়, হারানো স্বাস্থ্যও যেন তিনি ফিরে পেলেন।

আবার চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহচ্ছায়ায়।

*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বরে এসে বিষ্ণুমন্দিরের পুজোয় নিজেকে সমর্পণ করে অক্ষয়ও

যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন সকালে অক্ষয়ের জ্বর হল। প্রথমে সবাই ভাবলেন, সাধারণ জ্বর। পরে বুঝলেন, ব্যাপারটা সাধারণ নয়, ভয়ের কারণ আছে। ডাক্তার বৈদ্যের সকল আশ্বাস এবং সান্ত্বনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে অক্ষয়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে চলল।

* * *

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজীর লেখা থেকে জানতে পারি ("স্বজন বিয়োগ", পৃঃ ৩৭২) ঃ হৃদয় মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বলতেন, অক্ষয় শ্বশুরবাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষসগণবিশিষ্টা কোন কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, ছোঁড়া মারা যাবে দেখছি।"

এরপর যখন তিন-চারদিনেও অক্ষয়ের জ্বর কমল না, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ব্যাকুলভাবে হৃদয়কে ডেকে বললেন, "হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝতে পারছে না অক্ষয়ের বিকার হয়েছে। ভাল চিকিৎসক এনে আশ মিটিয়ে চিকিৎসা কর। ছোঁড়া কিন্তু বাঁচবে না।"

একথা শুনে হৃদয়ও বিচলিত হয়ে উঠলেন, ঠাকুরকে বললেন, "ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়ে ওরকম কথাগুলো কেন বার হল?"

—"আমি কি ইচ্ছে করে ওরকম বলেছি?" শ্রীরামকৃষ্ণ পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "মা যেমন জানান ও বলান, ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে তেমনই বলতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে?"

সবাই জানতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেন তা-ই সত্য।

ফলে ঠাকুরের মুখে এসব কথা শুনে এক অশুভ ভবিতব্যের কথা ভেবে হৃদয় খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ভালো ভালো ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করাতে শুরু করলেন।

কিন্তু এতসব চেষ্টা, এতসব উদ্যোগ—সবই যেন বিফলে যাচ্ছে। অক্ষয়ের দেহ-ক্ষয় যেন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। মৃত্যুর করাল গ্রাস যেন ধীরে ধীরে প্রসারিত হল অক্ষয়ের ব্যাধিজর্জর দেহের উপর।

এভাবে এক মাস কেটে গেল।

অক্ষয় তিলে তিলে পায়ে পায়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে মা ভবতারিণীর অঙ্গনে শেষ মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চললেন।

অন্তিমকাল যখন উপস্থিত হল, তখন তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অক্ষয় একবার চোখ মেলে তাকালেন তাঁর দিকে—সে দৃষ্টি যেন বহুদূরে প্রসারিত, যেন কোন এক অজানা জগতের অন্ধকার ভেদ করে অনন্তকালের দিকে ধাবিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ অক্ষয়ের কপালে হাত রাখলেন, ডাকলেন, "অক্ষয়—"।

বহুদূর থেকে যেন অক্ষয় অতিদূরে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "অক্ষয়, বল, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম।"

কোন এক অদৃশ্য জগৎ থেকে যেন অক্ষয়ের আর্ত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, পরপর তিনবার শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে ওই ক'টি কথা উচ্চারণ করলেন।

তারপরই সব শেষ।

চোখের সামনে এভাবে অক্ষয়ের বিদায় দেখে হৃদয় আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আর শ্রীরামকৃষ্ণ?

এত আদরের অক্ষয়কে চোখের সামনে এভাবে বিদায় নিতে দেখে তিনি যেন ভাববিষ্ট হয়েই হাসতে শুরু করলেন।

কিন্তু উচ্চ ভাবভূমিতে উপনীত হয়ে একটি অকাল মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী শ্রীরামকৃষ্ণের এই হাসি যেমন মহাজীবনের ইঙ্গিতবাহী, তেমনি আবার যখন তিনি সাধারণ জীবনে নেমে এলেন, তখন পুত্র-প্রতিম অক্ষয়ের মৃত্যুতে সেই শ্রীরামকৃষ্ণই শোকে-দুঃখে ক্ষণকালের জন্য পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

* * *

অক্ষয়ের এই অকাল মৃত্যুর পর সংঘটিত দুটি ঘটনাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যে কারণে অক্ষয়-প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপিত

হয়েছে।

এই দুঃসহ মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে নদীয়া জেলার প্রাচীন শহর রাণাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এক মহাব্রত পালন করেন—যা পরবর্তী কালে জননী সারদাদেবী এবং তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানগণের জীবনবেদে পরিণত হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, অক্ষয়ের অকাল মৃত্যুর ঠিক পরেই দক্ষিণেশ্বরে এলেন মা সারদা।

অর্থাৎ, শূন্যতা দূর করতেই তাঁর আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মহিমাকে সুনির্দিষ্ট পথে প্রকাশের জন্যই যেন তাঁর মন্দির প্রাঙ্গণে সেই নহবতখানায় অধিষ্ঠান।

এই ঘটনাগুলি কার্যকারণসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত বলেই এখানে রাণাঘাটের ঘটনাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন—যে ঘটনাটি এখনও সর্বজনের কাছে সুপরিজ্ঞাত নয়।

*   *   *

নদীয়া জেলাতেই একদিন শ্রীচৈতন্য মানুষকে ভালোবাসার এক অভয় মন্ত্র শুনিয়েছিলেন, আবার এই নদীয়া জেলাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মানব-সেবার এবং সেবাধর্ম মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন এক চরম মানসিক অস্থিরতাকে সম্বল করেই একটু স্বস্তি ও শান্তির আশায় মথুরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলেন রাণাঘাটে। অবতার হয়েও সেদিন তিনি সাধারণ মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই সাধারণ মানুষই রাণাঘাটের কাছে এক অনন্যসাধারণ ব্রত উদযাপন করেছিলেন। তিনি রাণাঘাটে গিয়েছিলেন রাণাঘাটের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রবাহিত যে চূর্ণী নদী সেই নদীপথে।

আজকের রাণাঘাট প্রাচীন এবং অতি আধুনিক জীবধারাকে একই সঙ্গে ধারণ করে রেখেছে। শহরটাকে পিছনে রেখে হাসপাতাল পেরিয়ে এলে এখনও গ্রামে সজীব গন্ধ পাওয়া যায়। পাকা রাস্তা একসময় হারিয়ে যায়, কাঁচা রাস্তা এসে মিশে যায় নদীর নরম মাটিতে। সেখানেই

খেয়াঘাট।

ওপারে কলাইঘাটা। একসময় নাম ছিল ক্লাইভঘাটা। এই এলাকাটাই একসময় রাণী রাসমণির জমিদারির অংশ ছিল। ক্লাইভঘাটার বুকে আজও দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট বট, অক্ষয় বট।

এই কলাইঘাটার বুকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন এক নবজীবনবেদের সূচনা করেছিলেন, এক মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। 'জীবে দয়া' নয়, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—এটা শুধু কথা নয়, এই সত্যকে তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজের জীবনে।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু সেবার নিজেই গেলেন খাজনা আদায় করতে, সঙ্গে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। এরকম আগেও নিয়েছেন। অক্ষয়ের অকাল বিয়োগে শোকার্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দুদিন বেড়িয়ে আসবেন—এই ছিল উদ্দেশ্য।

নৌকায় করে চূর্ণী নদী ধরে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরবাবু এলেন কলাইঘাটায়। জমিদারকে দেখার জন্য তীরে তখন দারুণ ভিড়। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ এবং জগৎপূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে যাননি,—একজন পুজারী ব্রাহ্মণ মাত্র।

সাধারণত মথুরবাবু নিজে কখনও খাজনা আদায় করতে আসতেন না। কিন্তু সেবার সেরেস্তায় খবর গেল: এই অঞ্চলে পরপর দু বছর অজন্মা হয়েছে, প্রজারা খাজনা দিচ্ছে না। তাই অবস্থা দেখতে জমিদারবাবু নিজেই এলেন।

এই ঘটনার বর্ণনা স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাকে দিয়েছিলেন এক পত্রের মাধ্যমে। 'উদ্বোধনে'র শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে আমরা সেই পত্রের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত ও অনুসরণ করতে পারি: "ক্রমাগত দুই বৎসর জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের অনাহার অনাক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় গভীর দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মথুরবাবুকে ডাকাইয়া হতভাগা প্রজাগণের খাজনা মাপ করিয়া তাহাদের পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান

করিতে অনুরোধ করিলেন।"

"মথুরবাবু বলিলেন, বাবা আপনি জানেন না পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেশ আছে। তাই বলে প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় না।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মথুর, তোমার নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে বই ত নয়। ইহাদের দুঃখ দূর করণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহাদের সাহায্য করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে।"

"মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।" কলাইঘাটার পুণ্যভূমিতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করে দেখিয়েছিলেন নবযুগের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে রাণাঘাটের ঘটনাটি উল্লেখ করেই দেওঘরের সন্নিহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। দুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুরবাবুকে দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীদর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘরের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন, বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না।"

শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু সেখানেও সেবাব্রত পালন করেন।

স্বামী শিবানন্দজী বলেছেন, "আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই দুই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।" অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কোন সংশয় বা প্রশ্নের অবকাশ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সন্ন্যাসী সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্যই সম্ভবত ওই দুটি ঘটনার কথা নিজেই তাঁদের বলেছেন।

রাণাঘাটের এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ আমরা স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' দেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী তেজসানন্দের "রামকৃষ্ণ জীবন" গ্রন্থেও স্বামী তেজসানন্দ বলেছেন: ওই গ্রামটির নাম যে কলাইঘাটা, সেটা ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় বলেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দজী 'লীলাপ্রসঙ্গে' একই সঙ্গে দেওঘর ও রাণাঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন: "শুনিয়াছি, মথুরের রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমিদারভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণা আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।"

সর্বজীবে ঈশ্বর বিরাজ করছেন—বেদান্তের এই সত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন মহিমায় মানব সংসারে প্রতিষ্ঠা করলেন।

মা সারদা পরবর্তীকালে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের বলেছেন, "বাবা, জানো তো জগতের প্রত্যেকের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবারে রেখে গেছেন।"

*   *   *

তাইতো তিনি এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহারে মা সারদাও যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

তাই তৃপ্ত হৃদয়ে নহবতের ছোট্ট কুঠুরিতে থাকার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তিনি ঠাকুর এবং চন্দ্রমণি দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

মূর্তিমতী সেবা যেন তাঁর মধ্যেই প্রাণ ফিরে পেল।

*   *   *

জয়রামবাটি গ্রামের সহস্র নিন্দা এবং অনুযোগ রামচন্দ্রের বুকেও এতকাল শক্তিশেলের মতই বিঁধে ছিল। মুখে তিনি কিছুই বলেননি —যদি সারদা দুঃখ পায়। মনে মনে সেই দুঃসহ ভার বহন করেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

কিন্তু এসে যা দেখলেন, তাতে তিনিও আশ্বস্ত হলেন, আত্মস্থ হলেন। দেখলেন তিনি, কন্যা সারুর মুখমণ্ডল থেকে কালো মেঘ সরে গেছে। সেই পবিত্র মুখে চোখে দেখা দিয়েছে জ্যোৎস্নার প্রশান্ত দ্যুতি। তাই তৃপ্ত হৃদয়ে তিনি ঠিক করলেন, আর নয়, এবার জয়রামবাটিতে ফিরে যেতে হবে। ফিরে গিয়ে গ্রামের সকলকে বলতে হবে, "সারুর বর কত

বড় মানুষ।"

তাই কয়েকদিন পরেই তিনি ফিরে গেলেন জয়রামবাটিতে

আনন্দময়ী মা সারদা আছেন নহবতের ছোট্ট কুঠুরিতে। ঠাকুর থাকেন নিজের ঘরে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবীকালের সঙ্ঘ জননীকে নানা উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়ে তৈরী করে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ" এসব কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি মা সারদাকেও বুঝিয়ে বলতেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে সংসার প্রসঙ্গ সবকিছুই গ্রথিত হত আলোচনা সূত্রে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে বললেন, "চাঁদা মামা যেমন সব শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বরও সকলেরই আপনার, তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাক তো তুমিও দেখা পাবে।"

দক্ষিণেশ্বরের মহামিলন কেন্দ্রে জননী সারদাও ঈশ্বর সাধনার সোপান বেয়ে এগিয়ে চললেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ায় ছায়ায়। ঠাকুর কত উপদেশ দিতেন, কত রকম উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।

কিন্তু সেখানেই সবকিছুর শেষ নয়। মা সারদা সেইসব উপদেশ কতটা অনুধাবন এবং গ্রহণ করতে পেরেছেন, পেরেছেন কতটা অনুসরণ করতে—তাও শ্রীরামকৃষ্ণ সতর্কভাবেই লক্ষ্য রাখতেন। সে সম্পর্কে সবসময় খোঁজখবর রাখতেন।

মা সারাদিন নহবতে থাকেন। কত কাজ তাঁর। শাশুড়ির সেবা যত্ন তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে রান্নাবান্নার কাজ, অতিথিদের জন্য

ব্যবস্থা। আড়ালে বসে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে কল্যাণময়ী সদাই ব্যস্ত থাকতেন।

সারাদিন নহবতে থাকলেও রাত্রে তিনি আসতেন ঠাকুরের ঘরে। সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি।

এও এক অভিনব জীবনসাধনা। স্ত্রীকে বর্জন করে নয়, ত্যাগ করেও নয়, রক্তমাংসের দুটি দেহ পাশাপাশি অবস্থান করেও দেহবুদ্ধির কত উপরে অনায়াসে উন্নীত হওয়া যায়—তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণটি সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণেই রচিত হয়েছিল। বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলন বা ধর্মজীবনের ইতিহাসে এ এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর মাকে বলতেন, অবসর সময়ে কী কী গৃহকর্ম করা প্রয়োজন, পরিবারের আত্মীয়স্বজনের প্রতি কী রকম ব্যবহার করা উচিত, অথবা অন্যের বাড়িতে গেলে কীভাবে ভব্যতা রক্ষা করতে হয়—ইত্যাদি সবকিছু খুটিনাটি। বেদান্তবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ মানবচরিত্র এবং সংসারজীবন সম্পর্কে কতটা অভিজ্ঞ ছিলেন, এ সব উপদেশ তারই প্রমাণ।

কিন্তু শুধু সংসারের কথা নয়, এক হাত ঈশ্বরের পায়ে দিয়ে অন্য হাত দিয়ে সংসার করতে শিখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তা মা সারদাকে সংসারজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কেও বিভিন্ন শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সুযোগে স্বীয় পত্নীকে ভবিষ্যতের মহাভার বহনের উপযোগী করে তুলতে প্রয়াসী হয়ে উঠলেন। লোকশিক্ষক ঠাকুর এখানেও গ্রহণ করলেন শিক্ষকের ভূমিকা।

"ভগবান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য", কিন্তু তার জন্যও তো সাধনা করা প্রয়োজন। তা না হলে উদ্দেশ্য সাধিত হবে কিভাবে? সেই সাধনার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষালাভ। উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষাগ্রহণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদান করার পদ্ধতি ছিল আলাদা। কেবলমাত্র

উপদেশ দিয়েই তিনি শিক্ষাদানের কর্তব্য-কর্মের অবসান ঘটাতেন না। শিষ্যকে একান্ত নিজের জনে পরিণত করে তিনি ভালোবাসার ঐশ্বর্যে আত্মীয় করে নিতেন। তারপর তাঁকে উপদেশ দিতেন।

একই নিয়ম আমরা লক্ষ্য করি জননী সারদার ক্ষেত্রেও।

* * *

প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভালোবাসার ফল্গুধারায় অবগুণ্ঠিত ও কুণ্ঠিত মা সারদাকে আপন করে নিয়েছিলেন। মা দক্ষিণেশ্বরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরম আদরে তাঁকে নিজের ঘরেই স্থান করে দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত সারদাদেবীর যথাবিহিত চিকিৎসার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের শয্যায় শয়ন করার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যা কিছু করেছেন, তা করেছেন শুধু মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। তাই দেহরহিত চেতনা নিয়ে তিনি স্বীয় পত্নীকে স্থান দিয়েছেন নিজের শয্যায়।

কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহ করতে গেলেন কেন?

তিনি যদি বিবাহ না করতেন, তাহলে সংসারী মানুষ বলত, "নিজে বিয়ে করেননি বলেই সকলকে ব্রহ্মচর্যের কথা বলেছেন। নিজে বিয়ে করলে আর ওসব বলতেন না।"

আদর্শ জীবন-যাপন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বিবাহ করেছেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের পর যখন তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থা সহজ হয়ে গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে এনে রাখলেন, সসম্মানে স্থান দিলেন নিজের শয্যায়। এভাবেই অতিবাহিত হল একটানা আট মাস।

আর তারপরই স্বীয় কর্মপত্নীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন জগদম্বার আবির্ভাব এবং তাঁকেই ষোড়শী মহাবিদ্যাজ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করলেন। এসম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এখানে শুধু উল্লেখ করা প্রয়োজন, দক্ষিণেশ্বরের সেই জীবন যাপনের প্রসঙ্গ উঠলেই জননী সারদা বলতেন, "সে যে কি দিব্যভাবে থাকতেন (শ্রীরামকৃষ্ণ), তা বলে বোঝাবার নয়। কখনও ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এইরকম সমস্ত রাত।"

দক্ষিণেশ্বরে সেই সময়কার পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে মা বলতেন, "সে কি এক আবির্ভাব-আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব-শরীর কাঁপত, আর ভাবতুম, কখন রাতটা পোহাবে! ভাব সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝেছিলেন স্বীয় সহধর্মিণীর এই অসহায় অবস্থার কথা। তাই একদিন তিনি নিজেই জননী সারদাকে শিখিয়ে দিলেন, "এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এইরকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে।"

এটা শিখিয়ে দেওয়ার পর মায়ের আর তেমন ভয় হত না। ব্যাপার-টাকে অনেকটা স্বাভাবিক করে নিতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে জননী সারদামণি বলছেন, "তখন আর তত ভয় হত না, ওইসব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ অনুসরণে (গুরুভাবের পূর্ববিকাশ, পৃঃ ১৩৯) জানতে পারি, যদিও ধীরে ধীরে মায়ের ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল, তবু কিন্তু উদ্বেগের ভাবটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। তাই, কখন আবার সমাধি হয়—সেই উদ্বেগে মা সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারতেন না।

*　　　*　　　*

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিবাহিত জীবনের অধিকারী হয়েও সন্ন্যাসীর জীবনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন, তখন তিনি এই বিবাহ-বন্ধনে বিজড়িত হয়ে মানুষকে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? এমন একটা প্রশ্ন

অনেক ছাপোষা গৃহস্থের মনেই উদিত হতে পারে। হয়ত উদিত হয়ও।

এই প্রশ্নের যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" (গুরু ভাবের পূর্ববিকাশ, পৃঃ ১৪০) গ্রন্থে। আমরা আপাতত তাঁকেই অনুসরণ করি।

তিনি বলেছেন: ঠাকুরের জীবনে বিবাহ বন্ধন কেবল সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্তই হয়েছিল। বিবাহিত জীবনের কী উন্নত পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তার কিছুটা পরিচয় শ্রীশ্রীমা'র আজীবন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করার কথাতেই বুঝতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে সারদানন্দজী বলছেন (গুরুভাবের পূর্ববিকাশ, পৃঃ ১৪৩): মানুষ অপর সকলের কাছে নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারলেও, স্ত্রীর কাছে কখনও তা লুকিয়ে রাখা যায় না। এটাই সংসারের নিয়ম।

এসম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সারদানন্দজী প্রমুখ শিষ্যদের বলতেন: "যতসব দেখিস হোমরাচোমরা বাবু ভায়া—কেউ জজ, কেউ মেজেষ্টর, বাইরের যত বোলবোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই।"

এই পটভূমিকায় এটা সহজেই বোধগম্য যে, কোন লোকের বিবাহিত পত্নী যদি তাঁর স্বামীর পবিত্র, উন্নত জীবন দেখে তাঁকে অকপটে হৃদয়ের ভক্তি দেয় এবং আজীবন তাঁকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, তা'হলে নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, ওই লোক বাইরে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তাতে কিছুমাত্র ভেজাল নেই।

সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্রতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সংশয়ের সুযোগ নেই। যেমন পবিত্রতা স্বরূপিনী মায়ের সম্পর্কেও কোন কিছু বলার কোন সুযোগ নেই।

* * *

মা সারদা প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর।

চার বছর আগে কামারপুকুরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আনিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। নিতান্তই বালিকা।

সেদিনের প্রসঙ্গ অনুধাবন করার জন্য আমরা অনায়াসেই লীলা-প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজীকে অনুসরন করতে পারি (প্রথম ভাগ, ষোড়শীপূজা, পৃঃ ৩৫৩) : দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোঝার মত শক্তি তাঁর মধ্যে এখন বিকাশোন্মুখ হয়েছিল মাত্র। পবিত্র বালিকা দেহবুদ্ধি বিরহিত ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরাত্মলাভে ওইকালে অনির্বাচনীয় আনন্দে উল্লাসিত হয়েছিলেন।

ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদের কাছে মা ওই উল্লাসের কথা অনেক সময় এভাবে প্রকাশ করেছেন, "হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণবট যেন স্থাপিত রয়েছে—ওইকাল থেকে সর্বদা এরকমই অনুভব করতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকত, তা বলে বোঝানো অসম্ভব।"

*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেই একদিন ঠাকুর শায়িত রয়েছেন। আর মা সারদা পতির পদসেবা করছেন।

ঘরের অখণ্ড নীরবতা ভাঙলেন মা। পদসেবা করতে করতেই ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন মা : "আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" প্রশ্নটা করেই অবগুণ্ঠনবতী আরও যেন কিছুটা সহজ হলেন।

প্রশ্ন যতখানি প্রত্যক্ষ ছিল, উত্তরও ছিল ঠিক ততখানি প্রত্যক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যয়ে উত্তর দিলেন : "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলেই তোমাকে সর্বদা সত্যিসত্যি দেখতে পাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিনী মা তখন নহবতে থাকতেন।

*　　　*　　　*

অন্য একদিন রাত্রে শ্রীমাকে একান্তে পেয়ে ঠাকুর পরীক্ষা করার বাসনায় প্রশ্ন করলেন : 'কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে

নিতে এসেছ?'

জননী সারদামণি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই উত্তর দিলেন: "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"

এ যেমন একদিনের ঘটনা। এখানে আরেকদিন রাত্রের এক রুদ্ধশ্বাস ঘটনা উল্লেখ করছি।

* * *

অন্যান্য দিনের মতই সেদিন রাত্রে মা এসে শুয়েছেন ঠাকুরের বিছানায়। ঠাকুরেরই পাশে।

রাত্রে হঠাৎ সমাধির এক বিরামক্ষণে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে, উঠে বসেছেন তিনি। দেখেন, তাঁরই বিছানায় মা সারদা শুয়ে আছেন—ঘুমে অচেতন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মনের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। নিজের বিবেকের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করতে উদ্যত হলেন। তাকিয়ে আছেন রূপযৌবনসম্পন্না অপরূপ দিব্যকান্তির দিকে।

নিজের মনকেই তিনি বলছেন "মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলেই জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু এটা গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।"

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিজের মনের মুখোমুখি হলেন, সরাসরি প্রশ্ন করলেন নিজের মনকেই: "ভাবের ঘরে চুরি কোর না, পেটে একখানি, মুখে একখানি রেখো না, সত্য বল, তুমি ওটা গ্রহণ করতে চাও, অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি ওটা চাওতো এই তোমার সম্মুখে রয়েছে, গ্রহণ কর।"

এক ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার সামনে নিজেকেই এনে নিজে দাঁড় করালেন। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

অন্ধকারের রহস্যঘন নির্জন অস্তিত্ব সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ এবং সন্নিহিত এলাকাকে স্তব্ধ এবং সমাহিত করে রেখেছে। সমগ্র বিশ্ব

গভীর সুষুপ্তিতে অচেতন—শুধু গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি এবং অবিরাম স্রোতধারা প্রাণের অস্তিত্ব বাণী ঘোষণা করে চলেছে।

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সম্মুখে শায়িতা মা সারদার দিকে আরেকবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর একসময় নিজের হাত যেন এগিয়ে গেল মায়ের দিকে।

কিন্তু সে শুধু একটি মুহূর্তমাত্র। মায়েব শরীর স্পর্শ করতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের অতলে উত্থিত সেই উদ্দাম ঝড় নিমেষের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। মন সহসা হয়ে গেল কুণ্ঠিত।

তারপরই সেই মন সমাধিপথে এমন বিলীন হয়ে গেল যে, সে রাত্রিতে মন আর সাধারণ ভাব ভূমিতে অবরোহণ করল না।

পরদিন প্রভাতেও সেই একই অবস্থা। সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও বাহ্য-জ্ঞান রহিত। তারপর ঈশ্বরের নাম কীর্তন করে বহু চেষ্টায় তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনা হয়।

সেই সময়কার ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন (লীলা-প্রসঙ্গ, ষোড়শীপূজা, পৃঃ ৩৬৩): "পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবন-সম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই কালের দিব্যলীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করেছি, তা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। এতে মুগ্ধ হয়ে মানব-হৃদয় স্বতই এঁদের দেবত্বে বিশ্বাসবান হয়ে ওঠে এবং অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা এঁদের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতে বাধ্য হয়।"

দেহবোধরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতি-বাহিত হত এবং সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করলেও তাঁর মন এত উচ্চে অবস্থান করত যে সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি একবারের জন্যও উদিত হত না।"

* * *

ধর্মসাধনার ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

এভাবেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁর দেহবুদ্ধিকে

পুরোপুরি নির্বাসিত করে এক অনাস্বাদিত জীবনের আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। এভাবে একসঙ্গে এক শয্যায় অবস্থান করেও এই দুশ্চর সাধনায় তাঁরা কতদিন আত্মমগ্ন ছিলেন, সে সম্পর্কে অবশ্য কিছু মতান্তর দেখা যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের "গুরুভাব-পূর্বার্ধে" (পৃঃ ১৫২) বলা হয়েছে, ঠাকুর এবং মা একসঙ্গে আট মাস শয়ন করেন। এই মত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতেও" সমর্থিত হয়। কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে ১৭৮ পৃষ্ঠায় ওই আট মাস শয়নের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" গ্রন্থে দুরকম তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৩০৯) আট মাসের কথা যদিও উল্লিখিত, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১২৮) বলা হয়েছে : "দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ঠাকুর ষোড়শীপূজা করলেন।"

অন্যদিকে শ্রীশশিভূষণ ঘোষ রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৩১) "শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই" ষোড়শীপূজার উল্লেখ দেখা যায়।

এইসকল মতান্তরের কথা স্মরণে রেখেও একটা বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তেই আসা যায় সেটা হচ্ছে এই যে, কথামৃত এবং লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত সময়সীমাই গ্রহণীয়। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদার এই অপূর্ব লীলা যে প্রায় এক বছরের মত সময়কাল পরিব্যাপ্ত ছিল সেটা কার্যকারণ পূর্বাপর ঘটনা থেকেই প্রমাণিত।

স্বামী সারদানন্দজীকে অনুসরণ করে আমরা জানতে পারি (লীলা-প্রসঙ্গ, ষোড়শীপূজা, পৃঃ ৩৬৩) : ওইভাবে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হয়ে ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হল—কিন্তু ঠাকুর ঠাকুরাণীর এই অদ্ভুত সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হল না। ভুলেও একবারের জন্য তাঁদের মন প্রিয় বোধ করে রমণকামনা করল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বিস্ময়কর এই পর্বে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় আবিষ্ট হয়ে মা সারদার অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও সংযমের কথা যথাযথ স্মরণে রাখেন না।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্বীকার করেছেন, মা সরদা যদি তাঁর সেই সাধনার যথার্থ নিস্কাম সঙ্গিনী না হতেন, তাহলে ঠাকুরের মত ঈশ্বর-প্রতিম সাধকের পক্ষেও এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সহজ ছিল না। মা সারদা অর্ধাঙ্গিনী সত্বার অনেক উপরে উঠে এসে বাস্তব অর্থেই সহ-ধর্মিনীর ভূমিকা পালন করেছিলেন—যা বিশ্বজনের কাছে এক শাশ্বত আদর্শের প্রতীক।

শ্রীরামকৃষ্ণও পরবর্তীকালে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের কাছে মা সারদা সম্পর্কে বলেছেন: "ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তা' হলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা, কে বলতে পারে?

নিজেই নিজের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: বিয়ের পর মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম "মা আমার পত্নীর ভিতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে"—পরে ওর (মা সারদা) সঙ্গে একত্রে বাস করে এইকালে, বুঝেছিলাম, মা' সেকথা সত্যি-সত্যিই শুনেছিলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ "শ্রী মা সারদা দেবী" গ্রন্থে (পৃঃ ৫৩) যথার্থই বলেছেন: লীলাচ্ছলে ঠাকুর যা কিছু বলেই থাকুননা কেন, আমরা কিন্তু জানি যে, আত্মতৃপ্ত আত্মরতি ও আত্মক্রীড় শ্রীরামকৃষ্ণের কোন অবস্থাতেই সংযমের বাঁধ ভাঙবার সম্ভাবনা ছিলনা এবং সাক্ষাৎ জগদম্বা শ্রীমায়ের পবিত্রতার জন্যও অপরের নিকট প্রার্থনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তথাপি আদর্শস্থাপনের উদ্দেশ্যে ওইরূপ লীলাবিলাস হয়েছিল বলেই লোককল্যাণার্থ সেই অতি গোপনীয় তথ্য প্রকাশ্যে বলা আবশ্যক ছিল। স্বামী ও স্ত্রীই পরস্পরকে ঘনিষ্ঠতমরূপে জানেন, সুতরাং লোক-দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের বিষয়ে ঠাকুরের এবং ঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রীমায়ের সাক্ষ্য প্রদানের একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার লীলাপ্রসঙ্গ কিংবা দিব্য সম্বন্ধ সম্পর্কে অসংখ্য

ঘটনার উল্লেখ অতি সহজেই করা যায়। কিন্তু তাঁদের সেই ঐশ্বরিক সম্বন্ধের পরিপূর্ণ এবং সার্থকতম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত ষোড়শী-পূজার ঘটনায়।

বিশ্বের ধর্মসাধক কিংবা যুগপ্রবর্তকদের জীবনে বা ইতিহাসে এমন ঘটনা শুধু বিরল নয়, অকল্পনীয়ও। সম্ভবত, কামারপুকুর এবং জয়রাম-বাটির দু'টি মহাজীবন, শিব ও শক্তি এবং অবতার ও অবতারের লীলা-সহচরীর পক্ষেই সেই অসম্ভব সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা হয়েছিল সম্ভব।

পুণ্যসলিলা গঙ্গা দিয়ে পবিত্র ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনন্ত-কালের পথে, অসীমের লক্ষ্যে। আর সেই গঙ্গাতীরে সেই মা জগদম্বার স্নেহচ্ছায়ায় সেই পূতভূমি দক্ষিণেশ্বরে রচিত হল আরেক দেবজীবনের অমৃতকথা।

এভাবেই কেটে গেল দিনের পর দিন মাসের পর মাস। অতিক্রান্ত হল দিন মাসের সময়সীমাও।

তবু "এই অদ্ভুত ঠাকুর ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভাঙ্গল না।" একবারের জন্য ক্ষণিকের দুর্বলতায় বিভ্রান্ত হয়েও তাঁদের মন দেহের সম্পর্ককে স্বীকার করতে রাজী হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণও নিজের মনের সঙ্গে সরাসরি এবং খোলাখুলি বোঝাপড়া করে দেখলেন, তিনি স্বীয় সহধর্মিনীকে কখনও ৺ জগদম্বার অংশভাবে এবং কখনও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দেখা ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কখনও দেখতে বা ভাবতে সমর্থ হননি।

তিনি সকল সংশয়ের উর্ধ্বে উঠে সেই স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করে তাঁকে এই ভয়ঙ্কর কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁরই অপার কৃপাতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন এখনও সহজ

স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হয়েই সবসময় সেখানে অবস্থান করছে।

তিনি বুঝলেন, তাঁর এই কঠিন সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে অনুভব করলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় যে, জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-বিরোধী কোন কিছুই তাঁর মনে আর উদয় হবে না।

* * *

জগতের ধর্ম আন্দোলন তথা আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে সংযুক্ত হ'ল এক বিস্ময়কর সিদ্ধিলাভের কাহিনী।

একটি নিতান্তই বালিকাকে তাঁর পুতুল খেলার বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই বালিকাই কিশোরী বয়সে যখন কামারপুকুরে পতিগৃহে এসেছিলেন—তখন তাঁর জ্ঞান উন্মেষের সেই আলো-আঁধারির বয়সে তিনি পেয়েছিলেন দিব্যপ্রেমের অচিন্ত্যপূর্ব স্বাদ। তারপর যখন সেই কিশোরীই ভরা যৌবনে এলেন দক্ষিণেশ্বরে—তখন তাঁর জীবন-ছন্দ অলৌকিক দেবজীবনোচিত সম্পদে হয়ে উঠল ঐশ্বর্যময়ী এবং শ্রীময়ী। তারপরই ধাপে ধাপে উপনীত হলেন সেই মহাবোধনের দ্বারপ্রান্তে, সেই মহাউদ্বোধনের ক্রান্তি লগ্নে।

এতদিনে নারীর অবগুণ্ঠন ভেদ করে দেবীত্ব প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার সময় হল সমাগত।

সম্ভবত ঐতিহাসিক দিক থেকে এর প্রয়োজনও ছিল অনিবার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার গুরুভার যার হাতে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে অর্পণ করবেন, যিনি ভাবীকালের সঙ্ঘজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্য অপেক্ষমানা—সেই মা সারদাকেই অন্তরের পূজা নিবেদন করে নিজের কাছে এবং জনসমাজে সম্মানিত এবং মহিমান্বিত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ করেছিলেন অভূতপূর্ব ষোড়শী পূজার মাধ্যমে।

তাছাড়া আরেকটি তাৎপর্যও ছিল নিহিত। যাঁকে স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধরাধামে রেখে যাবেন, যাঁর উপর দিয়ে

যাবেন এক মহাভার—সেই মা সারদাকে স্বীয় শক্তিবিষয়ে সজাগ এবং অবহিত করার প্রয়োজনেও আয়োজিত হয়েছিল ষোড়শীপূজা।

*　　*　　*

শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজা কবে করেছিলেন—সে সম্পর্কে সন তারিখের কিছু কিছু অমিল বিভিন্ন সূত্র অনুসারে পাওয়া যায়। "লীলা-প্রসঙ্গে" (সাধকভাব পৃঃ ৩৫৩-৫৪) বলা হয়েছে: মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে আসার বৎসরাধিক কাল পরে (বাংলা ১২৮০ সনের ১৩ জ্যৈষ্ঠ, বা, ইংরেজি ১৮৭৩ সালের ২৫ মে) ষোড়শী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'কিন্তু "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১২৮) জানানো হয়েছে: মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শী পূজা হয়েছিল।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মা সারদা এক শয্যায় আট মাস শয়ন করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করার পর একটি সিদ্ধান্তই যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে এবং সেটা হচ্ছে এই যে, মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে আসার পর ষোড়শী পূজা পর্যন্ত দুই মাস এবং পরে ছয় মাস ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছিলেন।

*　　*　　*

সেদিন ছিল বাংলা ১২৭৯ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ। আর ইংরেজি মতে ১৮৭২ সালের ৫ জুন। ঘোর অমাবস্যা তিথিতে ৺ফলহারিণী-কালিকা পূজার মহালগ্ন।

এই পুণ্য দিনে যেদিন সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উৎসবের পরিবেশ, আনন্দের সমারোহ। মন্দিরে সেদিন এক বিশেষ পর্ব। মহাকালী আদ্যাশক্তি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ। মহাকালীরই একরূপ এই ফলহারিণী কালিকার মধ্যে প্রকাশিত। মানুষ কর্মফল নিয়েই বেশি ভাবিত এবং বিব্রত। ফল লাভই হয় কর্মের উদ্দেশ্য।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম? ঈশ্বরের পাদপদ্মে সবকিছু সমর্পণ করে আত্মলীন হয়ে কর্ম করা—সেই কামনা-বাসনাহীন কর্ম, সেই নিষ্কাম কর্ম—সেটাই তো যথার্থ কর্মযোগ। এতে ফলের কোন প্রত্যাশা নেই, উচ্চারিত সেই মন্ত্র, "মা ফলেষু কদাচন।"

এই ফলকে হরণ করেন বলেই তো তিনি ফলহারিণী কালিকা আর তারই পূজা করে মানুষ সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করে মাতৃপাদপদ্মে। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় নানাবিধ ফলের উপাচার সাজিয়ে, বহুবিধ ফল নিবেদন করে ফলহারিণী কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

সেদিনও ছিল সেই ফলহারিণী কালীপূজারই পুণ্য দিন। মা ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায় এবং জ্ঞাতি সম্পর্কে মা সারদার ভাসুরপুত্র মুকুন্দপুরের দীনু পূজারী বিশেষ পূজার আয়োজন করতে বিশেষ ব্যস্ত। মন্দিরের সর্বত্র একটা কর্মচাঞ্চল্য।

সন্ধ্যা হয় হয়। কিন্তু এই উৎসবমুখর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায়?

তিনি সকল কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন নিজের ঘরে। আছেন একান্তে। তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বিশেষভাবে এবং বিশেষ উপাচারে পূজা করবার মানসে বিশেষ আয়োজন করেছেন। তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে শ্রীবিদ্যা বা শ্রীত্রিপুর-সুন্দরীর ৺ষোড়শী মূর্তিতে আরাধনা করার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত। আর এই মহাপূজার আয়োজন মন্দিরে হয়নি, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে আয়োজন হয়েছে তাঁরই নিজের ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পূজা-অর্চনার আয়োজনেই হৃদয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্থায়ী সঙ্গী। কিন্তু সেদিন মন্দিরে বিশেষ উৎসব, বহু মানুষের ভিড়—তাই তাঁকে কালী মন্দিরেই বিশেষ পূজায় হতে হবে ব্রতী। তবু এরই এক ফাঁকে তিনি এলেন। যথাসম্ভব আয়োজন করে এবং পূজার ব্যাপারে ঠাকুরকে সাহায্য করে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন।

অবশ্য রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালীন সেবাপূজা সম্পন্ন করার পর দীনু পূজারী এসে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। রহস্যাবৃত এই পূজার আয়োজন সম্পন্ন করতে।

দীনু পূজারী পূজা-আয়োজনে অভিজ্ঞ মানুষ। একমনে যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে পূজার যাবতীয় উপকরণ পরপর সাজানো হল, রাখা হল ঠিক ঠিক জায়গায়।

এ পূজায় আরাধ্যা দেবীর কোন প্রতিমা নেই, নেই কোন

প্রতিকৃতিও। অথচ সেই অদৃশ্য আরাধ্যা দেবীর জন্য আল্পনা দেওয়া সুন্দর আসন পাতা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যে চৌকির উপর ঠাকুর নিজে শয়ন করতেন, তারই উত্তর দিকে পূজকের সামনে স্থাপন করা হল সেই আল্পনা শোভিত আসন। এভাবে ষোড়শী বা ৺ত্রিপুরসুন্দরীর আরাধনা আয়োজন শেষ করতে করতে রাত ন'টা বেজে গেল। কাজ শেষ করে দীনু পূজারী চলে গেলেন। ঘরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একা।

* * *

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। উৎসবমুখর মন্দির প্রাঙ্গণের যাবতীয় কোলাহল এক সময় শান্ত হয়ে যায়। একে একে নিভে যায় প্রদীপ মালাও। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায় বিশ্ব-চরাচর। অন্ধকারের যেমন ভয়াবহ একটা রূপ আছে, তেমনি আছে অপরূপ মাধুর্যও। গঙ্গার এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে অবিরাম জলস্রোতই শুধু আপন গতিতে প্রবহমানা—অন্ধকারের আবরণ তার গতিকে রুদ্ধ বা স্তিমিত করতে পারেনি। আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা সেই অন্ধকারে আরো যেন দীপ্ত, আরো যেন দৃপ্ত।

বিশ্ব-চরাচর, নির্জন প্রকৃতি, রহস্যময় পঞ্চবটী—সবাই যেন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ৺ষোড়শী পূজার মহিমান্বিত স্বরূপ দেখার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষমান।

আর কেউ নয়, আর কেউ নেই—দেবীর এই রহস্যপূজার আসরে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু মা সারদাকেই সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিমিরাবগুণ্ঠনে আবৃত সেই ঘোর অমাবস্যার রাত্রে মা সারদা এসে উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। প্রতি রাত্রের অভ্যস্ত পদক্ষেপে তিনি আসেননি—এক অজানা জগতের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার শঙ্কা বুকে নিয়েই তিনি এলেন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ পূজায় বসলেন। আর মা সারদা বসলেন সেই পূজার একমাত্র সাক্ষীর আসনে। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছিলেন।

পূজার বিধি অনুসারে মন্ত্র পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার উপকরণ এবং

দ্রব্যগুলিকে শোধন করলেন। তারপর যথাবিহিত পূর্বকৃত্য শেষ করলেন। মা সারদা নীরব সাক্ষী।

পূজার প্রথম পর্বে কাজকর্ম শেষ করার পরই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আল্পনা শোভিত আসনে মা সারদাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণ পূজা দেখতে দেখতে মা সারদার অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হয়েছিল—কেমন যেন এক অর্ধ অচেতন অবস্থা তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু কেন উঠে দাঁড়ালেন, কীইবা করতে যাচ্ছেন-- ইত্যাদি ভেবে দেখার মত মানসিক অবস্থা তখন আর তাঁর নেই। তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধা এবং আত্মসমর্পিতা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেই নির্দিষ্ট আসনের কাছে—তারপর একসময় পশ্চিমদিকে মুখ করে ঠাকুরের সামনে সেই আসনে বসে পড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার হাতে তুলে নিলেন মন্ত্রপূত কলসের জল। সেই পবিত্র জল দিয়ে তিনি বারবার মা সারদার অভিষেক সম্পন্ন করলেন। মা সবকিছু দেখছেন, অথচ তাঁর সেই শূন্য দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কিছুই বুঝতে পারছেন না—এক অদৃশ্য শক্তির জোরে তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জীবন্ত মাতৃ-প্রতিমার দিকে মুখ করে আত্মগত স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তারপর উচ্চারণ করলেন প্রার্থনামন্ত্র : "হে বালে, হে সর্বশক্তিশ্বর অধীশ্বর মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর (মা সারদার) শরীর-মনকে পবিত্র করে এর মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

এরপর মায়ের অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধান ন্যাস করে ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিত বস্তু সকলের কিছু অংশ নিজের হাতে মায়ের মুখে তুলে দিলেন। মাতৃমূর্তি তখন আত্মসমাহিতা। সে এক অপূর্ব অবস্থা। ধীরে ধীরে আত্মসমাহিতা মা সমাধিস্থা হলেন। পূজ্যা যখন সমাধিস্থা, পূজক তখন অর্ধবাহ্যদশায় স্বগত-সংলাপের মত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ

সমাধিমগ্ন হলেন। "সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সঙ্গে আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হয়ে গেলেন।"

সেই নীরব-নিথর পূজ্যা-পূজকের নিমীলিত চোখের সামনে দিয়েই কালতরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। এভাবেই অনেকক্ষণ অতিবাহিত হল। নিস্তব্ধ জগৎ চরাচর নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন সেই অপূর্ব মিলন দৃশ্যের নির্বাক সাক্ষী।

ধীরে ধীরে রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরও পার হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আত্মজাগরণের কিছু কিছু লক্ষণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে শুরু করল। আগেকার সেই অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে গেলেন তিনি। তারপর এক সময় ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীকে করলেন আত্মনিবেদন।

* * *

এই অপূর্ব দেবী সাধনার সেখানেই শেষ নয়। আত্মনিবেদনেই সর্বস্ব নিবেদিত হয়নি।

তাই এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সঙ্গে নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি যথাসর্বস্ব দেবীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিলেন।

সে কি আনন্দ, সে কি তৃপ্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হল প্রণাম মন্ত্র: "হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিনি, হে শরণদায়িনী, ত্রিনয়নী, শিবগেহিনি গৌরী, হে নারায়নী, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণাম করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মনিবেদন এবং সর্বস্ব নিবেদনের পর প্রাণ সমর্পণ করে তিনি মাতৃরূপা সারদার চরণে প্রণাম করলেন।

অবতারবরিষ্ঠের এই অপূর্ব পূজা সমাপ্ত হল। "মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি" হল—তাঁর দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করল।

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-মহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন (জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন, পৃঃ ২২২): "ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনা সহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি

কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্তন সকল উপস্থিত হইয়াছিল।”

স্বামী সারদানন্দজী জানিয়েছেন : “আমরা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষ গুণসম্পন্ন।”

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে সেরকম কোন অভিমান না থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র।

সেই প্রসঙ্গেই স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন : “কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতিপদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়ন সম্মুখে ধারণপূর্বক তাঁহাকে সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন।”

নবযুগের প্রবর্তক এবং মানবমুক্তির অগ্রদূত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনাই প্রবাহিত ভিন্ন ধারায়। আমরা যদি সেই মূলধারার সন্ধান না পাই, তাহলে যেমন তাঁকে অনুধাবন বা অনুধ্যান করা সম্ভব হবে না, তেমনি সম্ভব হবে না সাধন পথে জননী সারদামণিকেও অনুসরণ করা।

* * *

বিদ্যা-অর্জন শুধু অন্ন সংস্থানের জন্য—শিক্ষার এই সঙ্কুচিত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে “চালকলা বাঁধা” লেখাপড়া তিনি শেখেননি। সংসারযাত্রা নির্বাহে সুবিধে হবে ভেবে যে পূজকের পদ তিনি গ্রহণ

করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেখানেও ধরাবাঁধা পথে তিনি চলতে পারেননি, ঈশ্বরলাভের জন্য হয়ে উঠেছিলেন উন্মত্ত।

আর সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়—এই সত্য প্রমাণ করতেই তিনি বিবাহিত হয়েও স্ত্রী গ্রহণ করলেন না। শুধুই কি তাই? যে মানুষ সঞ্চয়শীল হয়, সে কখনও ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারে না এবং সেই জন্যই সোনারূপা দূরে থাক, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন থেকে সমূলে উৎপাটন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ সাধক জীবনের কথা যখন আমরা ভাবি, তখন নির্মোহ অন্তরে তাঁর প্রস্তুতির কাহিনীটিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

* * *

৺ষোড়শী পূজার পর প্রায় ছয়মাস মা সারদা ঠাকুরের সঙ্গে প্রতি রাত্রে একই শয্যায় শয়ন করতেন। অর্থাৎ, আগেকার ব্যবস্থাই বহাল ছিল।

এই ছয় মাসে সংসারধর্ম পালনে মায়ের কোন ক্লান্তি ছিল না। মানবী সত্বার মধ্যে যেমন দেবীত্বের বিকাশ, তেমনি দেবীর মধ্যেও দেখি এক পরিপুর্ণ মানবীকে।

নহবতের ওই ছোট্ট ঘরে সারাদিন তাঁর কেটে যায়। বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর সেবা—সারাদিন তাঁর অনেক কাজ। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে তিনি যেন এক সেবা প্রতিমা। সারাদিন কাজকর্ম করতেন, তখন ঠাকুরের দেখাও পেতেন না। রাত্রে সব কাজকর্ম শেষ করে তারপর তিনি শুতে যেতেন ঠাকুরের ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভাব ও সমাধির সঙ্গে মায়ের পরিচয় খুব কমই ছিল। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি। তাই পতি সান্নিধ্যে থাকার আনন্দ কখনও কখনও তাঁর কাছে আতঙ্কে পরিণত হত।

ঠাকুর যখন তখন ভাবসমাধিস্থ হতেন—আর সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখে মা সারদা ভয়ে বিনিদ্র রাত যাপন করতেন। কখনও কখনও নির্বিকল্প সমাধিপথে শ্রীরামকৃষ্ণের মন সহসা এমনই বিলীন হত যে, তাঁর মধ্যে মৃত মানুষের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠত।

সেই দৃশ্য দেখে মা ভীত হয়ে পড়তেন এবং কখন আবার ঠাকুরের ওরকম সমাধি হবে, এ আশঙ্কায় তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমুতেও পারতেন না। চোখের পাতা এক করতে পারতেন না। রাতের পর রাত জেগে থাকেন, লক্ষ্য রাখেন, ঠাকুরের সমাধি হয় কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন জানতে পারলেন এ ঘটনা। মা রাতের পর রাত জেগে থাকেন—একথা জানতে পেরে তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি মাকে বললেন, "এখন থেকে তুমি নহবতেই শুতে যেও। আমার সঙ্গে এ ঘরে আর থাকতে হবে না।"

মা থাকেন নহবতে, মাঝে মাঝেই আসেন ঠাকুরের কাছে। আবার কখনও মাকে ঠাকুরই ডেকে পাঠান। কত বিষয়ে কত কিছু শেখান তিনি ভাবীকালের সঙ্ঘজননীকে।

১৮৭২ সালের মার্চ মাসে (বাংলা ১২৭৮ সনের চৈত্র) মা সারদা প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। আর জয়রামবাটিতে ফিরে গেলেন ১৮৭৩ সালের মধ্যভাগে (বাংলা ১২৮০ সনের মধ্যভাগ)। সব মিলিয়ে একবছরের কিছু বেশি সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করেন।

এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার পিছনে একটু কারণও ছিল।

৺ষোড়শী পূজার কিছুদিন পরেই জননী সারদামণি গুরুতর অসুস্থা হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য দক্ষিণেশ্বরে আসার আগেই তিনি মারাত্মক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। আসার পথেও জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েন —সে কাহিনীও আমরা জানি। এবারও তিনি গুরুতর পীড়িতা হয়ে পড়েছিলেন।

মথুরানাথের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার হয়েছিলেন শম্ভুনাথ মল্লিক—যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদদার বলা হয়। রসদদার মানে যিনি রসদ সংগ্রহ করে দেন।

মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শম্ভুনাথ মল্লিক রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ডাক্তার প্রসাদবাবুকে আনিয়ে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হচ্ছিল না।

অসুস্থ ও পীড়িত শরীর নিয়ে অবগুণ্ঠিতা মা যারপরনাই কুণ্ঠিতা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, এই অসুস্থ শরীর নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকলে তাতে শ্রীরামকৃষ্ণেরই অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠার কারণ হবে। তার চাইতে বরং জয়রামবাটিতে ফিরে যাওয়াই ভালো।

এ নিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গে একান্তে আলোচনাও করেছিলেন। শেষপর্যন্ত সবদিক ভেবে দক্ষিণেশ্বরের আনন্দধাম ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তিনি জয়রামবাটিতে ফিরে গেলেন কামারপুকুর হয়ে।

তখন কার্তিক মাস। এই কার্তিক মাস থেকে পরের বছর বৈশাখ মাস পর্যন্ত তিনি জয়রামবাটিতে ছিলেন।

এই অল্পদিনের মধ্যে কামারপুকুরে শ্বশুরবাড়িতে এবং জয়রামবাটিতে নিজের পিত্রালয়ে পরপর দু'টি অত্যন্ত শোকাবহ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

বাংলা ১২৮০ সনের ২৭ অগ্রহায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ শ্রীরামেশ্বর অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই রামেশ্বরই ছিলেন দক্ষিণেশ্বর বিষ্ণুমন্দিরের পূজক।

একই বছরে মায়ের ভাই কালীকুমারের উপনয়নের চতুর্থ দিনে রাম নবমী তিথিতে (২৬ মার্চ, ১৮৭৪) পিতৃদেব অশেষ পুণ্যবান রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। লক্ষ্য করার বিষয়, মা সারদার পিতৃদেব রামচন্দ্র ছিলেন রামগতপ্রাণ এবং এই সংসার থেকে বিদায়ও নিয়েছিলেন রাম নবমী তিথিতেই।

এখানে মায়ের পিতৃবংশ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

মায়ের পিতা ছিলেন রামচন্দ্র, মাতা শ্যামাসুন্দরী। রামচন্দ্রের পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা। পুত্ররা হলেন প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার,

বরদাপ্রসাদ এবং অভয়চরণ। আর দুই কন্যা হলেন সারদা এবং কাদম্বিনী।

জননী সারদামণি পিতাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন এবং তেমনি ভালো-বাসতেন। ধর্মপ্রাণ পিতাও সবটুকু স্নেহ উজাড় করে দিয়ে একান্ত আদরের "সারু"কে বড় করেছেন।

পিতা পরলোকগমন করায় মা সারদাও শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, হয়ে উঠলেন বিচলিত। জয়রামবাটির এত হাসি, এত আনন্দ—সব তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকল। সেখানে থাকতে মন আর চায় না। সেখানে যে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে পিতা রামচন্দ্রের স্মৃতি।

শেষ পর্যন্ত অখণ্ড পিতৃশোক ভোলার জন্যই তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

* * *

শুধুই কি পিতৃশোকে আহত হওয়ার কারণেই মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন না, অন্য কারণও ছিল?

স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে অনুসরণ (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৬০) করে আমরা জানতে পারি: জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সঙ্গে হয়ত বা মায়ের পিতৃকুলের নিদারুণ দারিদ্র্যেরও একটা সম্পর্ক ছিল।

জয়রামবাটির মুখুজ্জে পরিবারে রামচন্দ্রের অবর্তমানে দারিদ্র্য যেন বড় ভয়াবহ ও নিঃসীম হয়ে উঠেছিল।

রামচন্দ্রের আকস্মিক পরলোক গমনের পর শ্যামাসুন্দরী দেবী দেখতে থাকেন চারদিকে শুধু নৈরাশ্যের কালোছায়া। অভাব আর অভাব। শুধু "নেই নেই" ভাব।

ঘরে কোন সঞ্চিত অর্থ নেই, নেই কোন নিশ্চিত অন্নের সংস্থানও। অথচ শ্যামাসুন্দরীর পুত্ররা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক।

অর্থাৎ, পুত্রদের দিয়ে পিতার অনুসরণে যাজনক্রিয়াও সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া চাষবাসের কাজ কিছু ছিল, তা' থেকে আয়ও কিছু হত। কিন্তু সেসব দেখবে কে? রামচন্দ্রের অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র যদি সে-সময়

জয়রামবাটিতে থাকতেন, তাহলে হয়ত বা এ ব্যাপারে একটা কিছু করা সম্ভব হত।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র থাকতেন কলকাতায়। যজন-যাজন এবং পৌরোহিত্যের কাজে তিনি ছিলেন দক্ষ। এতে তাঁর কিছু আয়ও ছিল। তবে কলকাতায় নিজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার পর জয়রামবাটিতে পাঠাবার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

শ্যামাসুন্দরীর সুন্দর সংসারে নেমে এল দুঃখের অমানিশা। কিন্তু তিনি অভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামীহারা এই গৃহবধূ নাবালক সন্তানদের নিয়ে সেদিন সেই নিতান্তই গ্রাম্য পরিবেশে রচনা করেছিলেন এক কঠিন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত।

* • *

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, শ্যামাসুন্দরীর কন্যা জননী সারদাও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর কামারপুকুরে নিঃসীম, অভাবের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে এক দুর্জয় জীবনের তপস্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কারো কাছে হাত পেত না।" মা সারদা স্বামী-বিহনে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, স্বামীর ভিটায় এক নিঃসঙ্গ জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের অন্নসংস্থানের জন্য কখনও কারুর কাছে হাত পাতেননি।

অবতার ঘরণীকেও সেদিন এক কঠিন পরীক্ষায় আত্মমহিমায় হতে হয়েছিল উত্তীর্ণা। কোনদিন ভাত জুটত তো নুন জুটত না। আবার কোনদিন ভাতও জুটত না। সেদিন পুকুরপাড় থেকে শাকপাতা কুড়িয়ে এনে তাই সিদ্ধ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হত। শতছিন্ন শাড়ি, কিন্তু সেলাই করার উপায় নেই—নেই ছুঁচ, নেই সুতা। তাই ছিন্নবস্ত্রকে গিঁট বেঁধে তিনি লজ্জানিবারণের প্রয়াস পেতেন।

কিন্তু তাই বলে কারোর কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে যাননি, চাননি কারোর সহানুভূতিও। একমাত্র অপার আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর পাথেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে মা সারদাকে সেদিন কামারপুকুরে যে দুঃখজর্জর জীবন বরণ করে নিতে হয়েছিল, শ্যামাসুন্দরীকেও তাঁর স্বামীর অবর্তমানে জয়রামবাটিতে সেই একই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। শ্যামাসুন্দরীর এই দুঃখরাত্রির দুশ্চর সাধনা দেখেই কি মা সারদাও পরবর্তীকালে এক নীরব দুঃখসাধিকায় পরিণত হয়েছিলেন?

*　　　　*　　　　*

শ্যামাসুন্দরীর চোখের সামনে পুত্রকন্যারা অনাহারের জ্বালা ভোগ করছেন, তিনি মা হয়ে সে দৃশ্য দেখেন কি করে?

তাই শেষ পর্যন্ত উপায় হল।

জয়রামবাটির বাঁড়ুজ্জে পরিবার গ্রামের মধ্যে বিত্তবান বলে পরিচিত ছিল। তাঁরাও ছিলেন মূলতঃ কৃষিনির্ভর। ধান হত প্রচুর। সেই ধানকে চাল করার জন্য লোকের প্রয়োজন হত।

শ্যামাসুন্দরী ওদের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে আসতেন। নিজের বাড়ির ঢেঁকিতে সেই ধান কুটে চাল তৈরি করে দিয়ে আসতেন বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে। যতটা ধান ভানতে পারতেন তিনি, তার চার ভাগের এক ভাগ পেতেন মজুরি হিসেবে। তাতেই কোনরকমে ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছিল।

এভাবেই কঠোর পরিশ্রম করে তিনি ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে অনেকের কাছে অনেক কাহিনী বলেছেন—যার কিছু কিছু পরবর্তী সময়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে।

একসময় শ্যামাসুন্দরী নিজের পুত্রবধূ ইন্দুমতী দেবীকে বলেছিলেন: "আমরা ঘরে ভাত বসিয়ে দিয়ে শিওড়ে গিয়ে তরকারি নিয়ে এসেছি" (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬০)। জয়রামবাটি থেকে শিওড় গ্রামটা খুব কাছে ছিল না।

এছাড়া অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজও করেছেন অন্নের সংস্থান করতে। কাজের বাড়িতে এক সারিতে ষোলটা উনুন জ্বলছে—সেখানেও তিনি রান্না করেছেন। বিনিময়ে পেয়েছেন "এক হাঁড়ি ভাত আর এক

ধুচুনি চাল।"

এত কষ্ট করেও শেষ পর্যন্ত শ্যামাসুন্দরী পারেননি পুত্রকন্যাদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে, পারেননি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে। তাই নিরুপায় অবস্থায় ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে—একটু আশ্রয়ের আশায়, একটু অন্নের ভরসায়।

বড় ছেলে প্রসন্ন গেলেন জিবটায়। বরদাপ্রসাদ গিয়ে ঠাঁই নিলেন শিহড়ে হরেরাম ভট্টাচার্যের বাড়িতে। আর কনিষ্ঠ অভয় গিয়ে আশ্রয় পেলেন মামাবাড়িতে।

শ্যামাসুন্দরীর পাঁচ ভাই—রামব্রহ্ম, রামতারক, কেদার, শ্রীপতি ও বৈকুণ্ঠ। আর বোন ছিলেন একজন—দীনময়ী। এঁদের কারোরই বংশ-রক্ষা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শ্যামাসুন্দরীর পিতৃবংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সে যাই হোক, এই মামাবাড়িতে এসেই আশ্রয় পেয়েছিলেন অভয়—যিনি সেখানে থেকে লেখাপড়া শুরু করেন।

এভাবে যখন ভাইরা সব এখানে ওখানে চলে গেলেন, তখন মা সারদাও আর জয়রামবাটিতে থাকতে রাজি ছিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর ক্লেশ এবং উদ্বেগের উপশম করতেই যেন তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

বাংলা ১২৮১ সনে (ইংরেজি ১৮৭৪) তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

* * *

দক্ষিণেশ্বরে এসে স্থান পেলেন সেই ছোট্ট কুঠুরি নহবতে—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী তখনও আছেন।

এখানে একটা কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। মা সারদা নহবতেই মাথা গুঁজে থাকুন বা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেই থাকুন, দক্ষিণেশ্বরে আসার পর থেকে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল স্বামী ও শাশুড়ির সেবাযত্ন করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জননী শেষ বয়সে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। পুণ্যসলিলা গঙ্গাতীরে বসে তিনি শেষের সেইদিনটির জন্য শুধুই অপেক্ষা

করছিলেন। চলচ্ছক্তিহীন শাশুড়ি বহু ব্যাপারেই মা সারদার উপর নির্ভর করতেন। মা সারদাও হাসিমুখে শাশুড়ির সেবাকেই জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন।

মা সারদা দূরে কোথাও যেতে পারতেন না—কি জানি কখন শাশুড়ি ডাকেন। ডাক শুনলে সব কাজ ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গিয়ে বৃদ্ধার সামনে হাজির হতেন। কখনও কখনও এমনভাবে শাশুড়ির ডাক শুনে তিনি ছুটে যেতেন যে, অনেকে আতঙ্কিত হত, ছুটতে গিয়ে মাথাটা আবার নহবতের নিচু দরজায় না ঠুকে যায়।

একজন সেরকম আশঙ্কার কথা একদিন বলেই ফেললেন, বললেন, "এভাবে যে ছুটে যাচ্ছেন, মাথাটা যদি দরজায় ঠুকে যায়?"

একথা শুনে মা উত্তর দিয়েছিলেন, "হ'লই বা! তিনি আমার গুরুজন, আর মা। আহা, তিনি বুড়ো হয়েছেন! আমি যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাঁর অসুবিধা হতে পারে, সেইজন্য দৌড়ে যাই!"

সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী থাকতেন নহবতের দোতলায় আর মা সারদা থাকতেন একতলায়।

*   *   *

শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ জননীর সেবাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতেও মা সারদা দেহ মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ এই সময় প্রায়ই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থান করতেন। প্রকৃতিভাবের প্রাধান্যে আপ্লুত ঠাকুর নিজেকে মা জগদম্বার সখী বা পরিচারিকা বলে ভাবতেন এবং সেরকম আচরণও করতেন। তিনি মা সারদাকেও ভাবতেন আরেকজন সখী হিসেবেই।

এই বিচিত্র লীলায় মা সারদাও সানন্দে যোগ দিতেন। ঠাকুরের মধ্যে প্রকৃতিভাবের উন্মেষ দেখে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সযত্নে কাঁচুলি ও অলঙ্কার দিয়ে ঠিক নারীবেশে সাজিয়ে দিতেন। আর নিজে গ্রহণ করতেন তাঁর সখীর ভূমিকা। সে এক অপূর্ব আনন্দের স্বাদ।

শুধু একবার নয়, এই বিচিত্র লীলায় মা বারবার অংশ নিতেন।

তবে এ ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন মতামত ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে চাইতেন, যতখানি চাইতেন, মা শুধু আনন্দময়ী রূপে সেটুকু পূরণ করেই তৃপ্তি পেতেন। সাধকের লীলাসহচরী রূপে বরণ করে নিতেন অনন্য সাধিকা জীবন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করতে হবে সারদা-আবির্ভাবের পটভূমিকা। মা সারদার ত্যাগ ও সাধনার জীবন কোন আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। যদি আমরা একবার পিছনের দিকে তাকাই, সারদা-আবির্ভাবের পটভূমিকাটা স্মরণ করি, তাহলে দেখব, এটা একটা অনিবার্য পরিণতি। এই পবিত্রতা স্বরূপিণীর আবির্ভাব ক্ষেত্রটি জয়রামবাটিতে রচিত হয়েছিল অনিবার্য ভাবেই।

* * *

জয়রামবাটি গ্রামের কার্তিকরাম মুখোপাধ্যায়ের চার পুত্র—রামচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং নীলমাধব। এই ঈশ্বরচন্দ্রের কথা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। ত্রৈলোক্যনাথ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু তিনি অকালে পরলোকগমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যজন-যাজন করে সামান্য উপার্জন করতেন। আর অকৃতদার নীলমাধব কলকাতায় থেকে অল্প বেতনে চাকরি করতেন।

রামচন্দ্র তিন ভাইকে নিয়ে এক সংসারেই থাকতেন। যদিও যজন-যাজন করে তাঁদের কিছু আয় হত, কিন্তু আসল আয়ের উৎস ছিল কৃষি। তাঁদের যা জমিজমা ছিল, তা' জনমজুর লাগিয়ে নিজেরাই চাষ করতেন।

জয়রামবাটির কিছুদূরেই শিওড় (শিহড়) গ্রাম। সেই গ্রামের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে রামচন্দ্রের বিয়ে

হয়েছিল। হরিপ্রসাদের আসল পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানের মহারাজা তাঁদের মজুমদার উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্যামাসুন্দরী শ্যামবর্ণা যেমন ছিলেন, তেমনি নিজের নামের গরিমা বজায় রেখেছিলেন। খুব সুন্দরীও। রামচন্দ্র আর শ্যামাসুন্দরীর অমায়িক আচার ব্যবহার, ধর্মনিষ্ঠা, পরোপকারী মনোভাব এবং পবিত্র চরিত্র সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

এত সুখের মধ্যেও একটা অস্বস্তি সব সময় তাঁদের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধত। সব থেকেও যেন কিছুই নেই। মাতৃত্বের পূর্ণতা যেন কাছে এসেও রয়ে গেল দূরবর্তী। রামচন্দ্রের অতৃপ্ত পিতৃহৃদয় সন্তান কামনায় হয়ে উঠল চঞ্চল।

একটি সন্তান লাভের প্রার্থনা নিয়ে শ্যামাসুন্দরী মন্দিরে মন্দিরে দেবতার দরজায় গিয়ে করজোড়ে দাঁড়াতেন। সন্তানভিক্ষা করে মানত করতেন জয়রামবাটির জাগ্রত দেবী সিংহবাহিনীর কাছেও।

স্বীয় পত্নীর দীর্ঘশ্বাসের ঝড় রামচন্দ্রের বুকে সৃষ্টি করত অস্থিরতা। তবু তিনি নিজের বেদনাকে সংগোপনে রেখে পত্নীকে আশ্বাস দিতেন, শোনাতেন স্তোকবাক্য। কিন্তু মুখে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করলেও অন্তরে তিনিও হয়ে পড়েছিলেন নিঃস্ব। সন্তানের অভাবেই এই নিঃস্বতা। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনিও বারবার ছুটে যেতেন মন্দিরে —যেখানে অন্তর্যামী দেবতা বিরাজিত। ইষ্টদেবতার কাছে জানাতেন প্রার্থনা, "আর কিছু চাই না, প্রভু, শুধু একটি সন্তান।"

*　　　*　　　*

তখন বসন্তকাল।

প্রকৃতির রিক্ততা বিদূরিত। নতুন জীবনের স্পন্দন আর সম্ভাবনা সর্বত্র বিভূষিত।

এমনই একদিন গোধূলিলগ্নে কোন এক অজানার ইঙ্গিতে অদৃষ্টের আকর্ষণে রামচন্দ্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এসে দাঁড়ালেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সংসারে—যেখানে নতুন নতুন সাজ, নতুন নতুন সজ্জা।

এক অজানা উন্মাদনায় তিনি তখন অধীর, গিয়ে দাঁড়ালেন সেই

নিত্যকালের চেনা আমোদর নদের তীরে। স্রোতস্বতী আমোদরের কাকচক্ষু জলে ছড়িয়ে পড়েছে আবীর রঙ—সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের শেষ সিঁড়িতে। রক্তিম আভায় আকাশের গায়ে আবীরের ছোপ, নদীর জলে তারই প্রতিফলন। গোধূলি লগ্নের মোহময় আবরণ প্রকৃতির সর্বাঙ্গে।

এই আমোদর রামচন্দ্রের কাছে কতদিনের চেনা-জানা। কিন্তু আজ যেন সবই নতুন। এই আমোদরের তীরে তিনি বোধহয় আশৈশব সহস্র-বার এসেছেন। কিন্তু আজ যেন তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা। ওই যে আকাশ, ওই যে নদী, ওই যে দিগন্তছোঁয়া মাঠ, ওই যে আকাশ ডিঙিয়ে পাখীদের ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা, ওই যে গাছে গাছে রাত্রির ছায়া প্রলম্বিত—এসবই রামচন্দ্রের বহুবার দেখা। বহুদিনের চেনা। শিশুকালেই প্রথম পরিচয়। তবু আজ যেন তাঁর কাছে সবকিছুই নতুন। এই যে আনন্দ আকাশে-বাতাসে, সেও তাঁর কাছে এক অনাস্বাদিত জীবন-বোধে আনন্দময়।

এই আনন্দময় পরিবেশে তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেল অবসাদ, দূর হয়ে গেল হতাশার আস্তরণ, দূর হয়ে গেল শ্রান্তিক্লান্তির আধিপত্য। রামচন্দ্র তখন আনন্দময় নতুন মানুষ। আনন্দ অন্তরে, আনন্দ বাইরে, আনন্দ চরাচরে।

কতক্ষণ আত্মমগ্ন অবস্থায় সেই নির্জন নদীতীরে তিনি মুগ্ধ-বিস্ময়ে বসেছিলেন—তা' তাঁর আর খেয়াল ছিল না। নদীস্রোতের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তাই কালস্রোতের হিসেব রাখতে পারেননি।

একসময় সন্ধ্যার ধূসর আস্তরণ মাটি, নদী, আকাশের বুকে মেলে দিল পাখা। নিঃসঙ্গ রামচন্দ্রের তখন একমাত্র সঙ্গী এই রূপবতী এবং ঐশ্বর্য-বতী প্রকৃতি।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নেমে গেলেন নিচে। স্পর্শ করলেন আমোদরের জল—আঃ কী শান্তি। হাতমুখ ধুয়ে সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করলেন শুদ্ধচিত্তে। শুচিস্নিগ্ধ হৃদয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন ইষ্টদেবতাকে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সব

পাখী তাঁরই মত ফিরে চলেছে ঘরের দিকে। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে আরেকবার চারদিকে চোখ মেললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দিগন্ত রেখার একটু উপরে বিরাট এক সিংহ—ঠিক তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

চমকে উঠলেন তিনি। এ তিনি কী দেখছেন? ভালো করে দেখলেন, সেই বিশাল সিংহের চোখে মুখে বিন্দুমাত্র হিংসার চিহ্ন নেই। প্রশান্ত তার দৃষ্টি, প্রসন্ন তার ভাব।

তারপরই তাঁর চোখে পড়ল, সেই সিংহের পিঠে বসে আছেন জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। এ কী দেখছেন তিনি? নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—এও কি সম্ভব? সেই প্রসন্নময়ী মাতৃমূর্তির চারখানি হাত, সর্বাঙ্গে বিভিন্ন অলঙ্কার—এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, অন্য দুই হাতে ধনুর্বাণ। সিংহের পিঠে বসে আছেন—একটি পা প্রসারিত ভূপৃষ্ঠের দিকে। কমলচরণ কোমল ধরণীর বুকে।

ইনিই কি তাহলে দেবী জগদ্ধাত্রী? ব্রাহ্মণ একথা ভেবে বারবার রোমাঞ্চিত হলেন। এত ভাগ্য! দেবী এত প্রসন্ন? জীবনপাত সাধনায় যাঁর দর্শন পাওয়া যায় না—সেই শক্তিরূপা জগদ্ধাত্রা অশেষ করুণা করে নিজেই তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন—এও কি সম্ভব?

ভুবনমোহিনী সেই মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ অবশ হয়ে গেলেন, হয়ে গেলেন আচ্ছন্ন।

তারপর একসময় দেবী জগন্মাতা মিলিয়ে গেলেন অনন্তের পারাবারে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ ব্রাহ্মণ এতক্ষণ প্রণাম করতেও ভুলে গিয়েছিলেন। এবার সম্বিৎ ফিরে এল। দু'চোখে তাঁর জলের ধারা—আনন্দে তিনি কাঁদছেন। তারপর লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতলে, জানালেন কৃপাময়ী দেবীর উদ্দেশে ভক্তের প্রণাম। মন-প্রাণ তাঁর স্বর্গীয় আনন্দে তখন আপ্লুত।

তিনি তখন নতুন মানুষ।

ঘরে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু মনে তাঁর সেই এক উন্মাদনা, চোখের সামনে তাঁর সদা উপস্থিত সেই দিব্যজ্যোতি মাতৃমূর্তি।

এই আনন্দ রসঘন আবেশেই ব্রাহ্মণের দিন অতিবাহিত হতে থাকে।

তারপর একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, দেখলেন, তৃতীয় মহাবিদ্যা—রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী এসে তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন।

এত করুণা কেন? ব্রাহ্মণ কিছুতেই তার অর্থ খুঁজে পান না। দেবী মহামায়া বারবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে কেন তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন—সেই রহস্যের কোন কূল-কিনারা তিনি খুঁজে পেলেন না। তাই হয়ে উঠলেন অধীর, হয়ে উঠলেন উন্মনা।

কারণ, তিনি নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের সাধনাই করেছেন জীবনভর, মহামায়ার উপাসনা তো তিনি করেননি এতকাল। তবু কেন এই অপার করুণা?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাননি তিনি।

তারপর আরেকদিন।

সেদিন রাত্রে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন, দেখলেন ভুবনভোলানো সেই মায়ের হাসি, সেই জগদ্ধাত্রী রূপ। তবে সেদিন তিনি দ্বিভুজা, সেদিন তাঁর সাধারণ মানবীয় রূপ।

এই অপরূপ রূপের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না তিনি। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন মা জগদ্ধাত্রীর দিকে।

এবার সেই মাতৃমূর্তি সরব হলেন, প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, "বাবা, এবার হেমন্তশেষে তোর বাড়ি যাব।" (শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত "সারদা-রামকৃষ্ণ", পৃঃ ১২)

* * *

ব্রাহ্মণ বুঝলেন দৈব ইঙ্গিত, বুঝলেন এই দরিদ্রের কুটিরেই জন্ম নেবেন কোন দেবী-মানবী।

ধীরে ধীরে শ্যামাসুন্দরীর দেহে সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণগুলিও স্পষ্ট হতে থাকে।

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী পবিত্র হৃদয়ে দেবী জগদ্ধাত্রীর চিন্তায় দিন-যাপন করতে থাকেন।

প্রকৃতির সংসারে এবার এসে দেখা দিলেন হেমন্তরানী—সর্বত্র তারই আয়োজন। দিগন্তছোঁয়া প্রান্তর সোনা রংয়ের ধানে পরিণত হয়েছে সুবর্ণপ্রান্তরে। প্রকৃতির সর্বদেহে ফলের সম্ভাবনা। কৃষিপ্রধান জয়রামবাটি গ্রামেও তাই উৎসবের পরিবেশ।

শেষ পর্যন্ত দৈববাণীকে সার্থক করে হেমন্তের শেষেই তিনি এলেন।

সেদিন ছিল বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ। ইংরেজি ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি।

সেই লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যালগ্নে পুণ্যবতী শ্যামাসুন্দরীর কোলে জন্ম নিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। কামারপুকুরে এসেছেন নারায়ণ, জয়রামবাটিতে এলেন লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী যে এলেন, তাই সে বছর ফলল আশাতীত ফসল। সংসারের অভাব হল দূর। কন্যাসন্তানের মধুর হাসিতে সংসারের নিরানন্দ হল নির্বাসিত। রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়িতে সেদিন আনন্দের হাট।

রামচন্দ্র মনে মনে কামনা করেছিলেন একটি কন্যাসন্তান। প্রথম সন্তান যেন কন্যা হয়, যেন অন্নপূর্ণা হয়। সংসারের অভাব দূর হবে। তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হয়েছে।

এই বহু সাধনার ধন কন্যার দু'টি নাম—সারদাসুন্দরী এবং ঠাকুরমনি দেবী। গ্রামের লোকেরা বলত "ঠাকরুণ দিদি", মা বাবা ডাকতেন সারু।

এবার আবার ফিরে যাই দক্ষিণেশ্বরে—যেখানে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা "সারু" পবিত্রতা স্বরূপিণী মা সারদার বেশে এক অনন্যসাধারণ জীবনবেদ রচনা করে চলেছেন।

আগেই বলেছি, মা সারদা দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৭৪ সালে (বাংলা ১২৮১ সনে)।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকরা দেখতে যেত, আর দরজার দু'দিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, আহা কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো। দক্ষিণেশ্বরে সে সময় আমাশয় রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণও রেহাই পান না। আক্রান্তা হন মা সারদাও। বর্ষাকালে মায়ের রোগ খুবই বেড়ে গেল। আমাশয়ের জন্য তিনি খুবই কষ্ট পেতে থাকেন।

শম্ভু মল্লিক মায়ের এই কষ্ট দেখে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। প্রসাদবাবুকে দিয়ে চিকিৎসাও করালেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হল না।

ওই ছোট্ট নহবত থেকে আমাশয় রোগে আক্রান্তা মা এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়লেন। তবু তিনি মানিয়ে নিলেন। কিন্তু অন্যরা বললেন, এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে থাকা নিরাপদ নয়। এখানকার জল-হাওয়াও ভালো নয়। দেশে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু তাতে মা রাজি নন। বৃদ্ধা শাশুড়ি এবং আত্মভোলা পতির সেবা করার এই সুযোগ ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে রাজি নন। যেতে চান না জয়রামবাটিতেও।

এভাবেই সকল কষ্ট স্বীকার করে তিনি এক বছর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি বলছেন, "দক্ষিণেশ্বরে এক বছর ভুগে দেশে গেছি" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য়, পৃঃ ১৩১)।

এক বছর রোগভোগের পর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তিনি জয়রামবাটিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৮৭৫ সালে, বাংলা ১২৮২ সনের আশ্বিন মাসে তিনি জয়রাম-বাটিতে আবার ফিরে এলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থেকে যে আমাশয় রোগ নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে এলেন, সেই রোগ গ্রামের মাটিতে এসে আরও প্রবল হয়ে উঠল। রোগ-

ভোগে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে মা সারদা শেষ পর্যন্ত শয্যা নিতে বাধ্য হলেন। একসময় মায়ের অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল যে, কেউ কেউ তাঁর জীবনরক্ষার ব্যাপারেও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

*   *   *

এই দুঃসংবাদ লোকমুখে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পেঁছিল। আশঙ্কার খবর শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সবকিছু শুনে তিনিও রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন

শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকে পাঠালেন হৃদয়কে, বললেন মায়ের কথা। তারপর গভীর আক্ষেপে মা সম্পর্কে বললেন, "তাইতো রে হৃদে, ও (শ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না?"

*   *   *

ওদিকে জয়রামবাটিতে মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। বারবার তাঁকে শৌচে যেতে হত। ফলে শরীর এত শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, বারবার শৌচে যাওয়ার দৈহিক ক্ষমতাও তাঁর অবশিষ্ট ছিল না।

তাই ঘরের পাশেই "কলুগেড়ের" পাড়ে তিনি শুয়ে থাকতেন। মা এক জায়গায় বলছেন, "কলুপুকুরের ধারেই থাকতুম।"

সে সময়ে নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "একদিন পুকুর জলে (নিজের) শরীর পানে চেয়ে দেখি শুধু হাড়সার হয়েছে, দেহেতে কিছুই নেই।" জলের বুকে প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁতকে উঠলেন।

তখন মনে মনে ভাবলেন, "আরে ছিঃ! এই দেহ তবে আর (রাখা) কেন? এইখানেই দেহটি থাক, দেহ ছাড়ি।"

এভাবেই যখন দেহ-যন্ত্রণায় কাতর মা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করছিলেন, ঠিক সেই সময় এক আত্মীয়া এসে বললেন, "ওমা, তুমি এখানে পড়ে কেন? চল চল ঘরে চল।"

তিনিই মাকে সেই পুকুর পাড়ের অবসন্ন অবস্থায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সে সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে মা সারদা বলেছেন : "কী অসুখই করেছিল, কিছুতেই সারে না। তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক কান দিয়ে রস ঝরছে।"

সারদার এই অবস্থা দেখে তাঁর ভাই উমেশ এসে একদিন বললেন, "দিদি, এখানে ৺সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে ?"

উমেশই মাকে রাজি করিয়ে জয়রামবাটির জাগ্রতা দেবী সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

সেই ঘটনার কথা স্মরণ করে মা সারদা বলেছেন "পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যা—চক্ষে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চক্ষু গেছে। গিয়ে মায়ের (সিংহবাহিনীর) মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশয় তিন-চারবার, হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই শৌচে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল, ঐখানে তার ঘর। সে মাঝে মাঝে গলা খাকারি দিত, আমি ভয় না পাই। পড়ে রইলুম।"

আজ যিনি বিশ্বজননী—সেই মা সারদা সেদিন জয়রামবাটির মাটিতে দেহ লুটিয়ে দিয়ে এক কঠিন অসুখের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। স্বয়ং অবতারঘরণী বা অবতারের লীলাসহচরী হয়েও দৈবশক্তির কাছে করছেন আত্মসমর্পণ। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রও কি একদিন শক্তিরূপা দেবী দুর্গার শরণাপন্ন হননি ?

সিংহবাহিনীর দুয়ারে এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পরিণামে অচিরেই ঘটল সিদ্ধিলাভ।

কামারদের মেয়ের বেশে একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল সারদা জননীর কাছে। বয়স কতই বা হবে। বড়জোর ১২ বা ১৩—ঠিক রাধুর (মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী) মত অত বড়। অচেনা এই মেয়েটি সারদা জননীকে বললেন, "যাও যাও উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে (সারদাকে) ফেলে রাখতে আছে ? এক্ষুনি (ঘরে) আনগে।"

সারদা জননী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির দিকে, "কে এই মেয়েটি।"

মেয়েটি কিন্তু আপনমনেই বললেন, "এই ওষুধ দিও (সারদাকে)।

এতেই ভাল হয়ে যাবে।"

একথা বলেই একটা ওষুধ দিয়ে মেয়েটি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আবার এই মেয়েটিই গিয়ে দেখা দিলেন সিংহবাহিনীর দুয়ারে হত্যা দেওয়া মা সারদাকে। মেয়েটি সারদাকে বললেন, "লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে ফুট (ফোঁটা ফোঁটা করে) দিও, ভাল হয়ে যাবে।"

সারদা-জননীকে যে ওষুধ সেই মেয়েটি দিয়েছিলেন, সারদা সেটি নিলেন। আর লাউফুলের ফুটও তিনি চোখে দিলেন। সেই দিনই চোখ ভাল হয়ে গেল। আর শরীরের সব ফুলোটুলো কমে গেল।

মা সারদা বলেছেন, "বেশ ঝরঝরে হলুম। সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা করত বলতুম, মা (সিংহবাহিনী) ওষুধ দিয়েছেন। সেই হতেই মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার হল। আমিও ওষুধ পেলুম, জগতও ধন্য হল।"

তারপরেই জয়রামবাটির সিংহবাহিনীর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এই মন্দিরের মাটি মা সারদা নিজের সঙ্গে রাখতেন, বলতেন, "বড় জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটি কৌটায় করে রেখেছি। নিজে খাই এবং রাধুকে রোজ সেই মাটি একটু করে খেতে দিই।"

* * *

"শ্রীমা সারদা দেবী" গ্রন্থের লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দজী এই প্রসঙ্গে বলছেন (পৃঃ ৬৩): "জীবনের আশা যখন নাই, তখন দেবীর স্মরণ লইয়া শ্রীমা আরোগ্যলাভ করিলেন। জগদ্বাসী ইহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইল যে দৈবীশক্তি অমোঘ। তবে সে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে: শ্রীমায়ের ন্যায় যাহাদের চিত্ত ভক্তিতে পরিপূর্ণ, কেবল তাঁহারাই ইহাতে সফলকাম হন। কিন্তু এই সকল দৈব-শক্তিসম্পন্ন মহামানবের ঐকান্তিক ভক্তিতে দেবতার একবার জাগরণ হইলেও অপরেও সে মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে। সিংহবাহিনীর প্রতি শ্রীমা চিরজীবন অগাধ শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করিতেন।"

* * *

স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে অনুসরণ করে সিংহবাহিনীর জাগ্রত মহিমা

সম্পর্কে এখানে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করা সঙ্গত হবে।

শ্রীমায়ের বাড়িতে একটি রাখাল বালক কাজ করত। সেই রাখালকে একবার এক ভয়ঙ্কর বিষধর শাঁখামুটি সাপ তর্জনীতে কামড়ায়।

সকলেই ধরে নিলেন, রাখালের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু মা সারদা বললেন, "রাখালকে ৺সিংহবাহিনীর মাড়োতে নিয়ে গিয়ে এখনই স্নানজল খাওয়াও। আর তর্জনীতে যেখানে সাপ দংশন করেছে সেই ক্ষতস্থানে সিংহবাহিনীর মাটি দিয়ে প্রলেপ লাগাও।"

শেষ পর্যন্ত মায়ের কথামত তাই করা হয়েছিল এবং তাতেই রাখাল-বালক বিষমুক্ত হয়। জীবন ফিরে পায়।

আরেকবার মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেব মাঠের আলপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বিষধর সাপের দংশনে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শ্রীমা এক্ষেত্রেও সেই ক্ষতস্থানে ৺সিংহবাহিনীর মাটি এনে প্রলেপ দেন এবং সারারাত ভূদেবের পাশে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত ভূদেবের জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি সম্পূর্ণ বিষমুক্ত হন।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল স্বামী গৌরীশানন্দের ক্ষেত্রেও। তিনিও সর্পদষ্ট হন। কিন্তু ৺সিংহবাহিনীর দৈব মাটির কল্যাণেই নবজীবন লাভ করেন।

* * *

সারদা জননীও একবার বিশ্বধাত্রী জগদ্ধাত্রীর দর্শন পেয়েছিলেন। সেই কাহিনী আমরা মা সারদার মুখেই জানতে পারি। তিনি বলছেন: "এক-বার গ্রামের (জয়রামবাটি) কালীপুজোর সময় আড়াআড়ি করে আমাদের চাল (পুজোর জন্য) নিলে না। মা চাল-টাল তয়ের করে রেখেছিলেন—পুজোর যোগান।······মা সমস্ত রাত্তির কেবল কাঁদলেন, কালীর জন্য চাল (তৈরি) করেছি, আমার চাল নিলে না? এ চাল আমার কে খাবে? কালীর এ চাল তো কেউ খেতে পারবে না।"

মা সারদা বলছেন, তারপর রাত্রে দেখেন কি জগদ্ধাত্রী, লাল রং, দুয়ারের ধারে পায়ের উপর পা দিয়ে বসেছেন।······জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গা চাপড়ে চাপড়ে ওঠালেন। উঠিয়ে বলছেন, "তুমি কাঁদছ কেন?

কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি ?"

বিস্ময়াবিষ্টা সারদা জননী প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি ?"

উত্তরে জগদ্ধাত্রী বললেন, "আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পুজো গ্রহণ করব।"

পরদিন সকাল হতেই সারদা-জননী কন্যা সারদাকে প্রশ্ন করছেন, "হ্যাঁরে সারদা, লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে ও কি ঠাকরুন ? আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।"

এরপর সারদা-জননীর মুখে সেই এক কথা, "আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।"

সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মা সারদা পরবর্তীকালে বলেছেন, "জগদ্ধাত্রী পু্জোর জন্য বিশ্বাসদের (গ্রামের বিশ্বাস পরিবার) থেকে মা দু আড়া (১৩ মন) ধান আনালেন।"

কিন্তু এমন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। সারাদিন বৃষ্টি, দিনের পর দিন বৃষ্টি।

সারদা জননীর মুখেও নেমে এল মেঘের কালো ছায়া। এত সাধ করে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করতে উঠে পড়ে লাগলেন, আর বৃষ্টি এসে সব পণ্ড করে দিচ্ছে।

তিনি তখন মা জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন, "মা কি করে তোমার পুজো হবে, ধানই শুকোতে পারলাম না।"

সে কথা যেন জননী জগদ্ধাত্রী শুনলেন।

সকলে দেখলেন এক অদ্ভুত কাণ্ড। "মা জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ"—বলছেন সারদা।

*　　　*　　　*

জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পু্জো হবে—সে খবর শ্রীরামকৃষ্ণকে দিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন মায়ের ভাই প্রসন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সবকিছু শুনে বললেন, "মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ,

বেশ।” তারপর একটু থেমে তিনি আবার প্রসন্নকে বললেন, “তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে।”

প্রসন্ন বললেন, “আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।”

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “এই আমার যাওয়া হল; যা বেশ পুজো করগে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু জয়রামবাটিতে গেলেন না। তবে প্রসন্নকে তিনি অভয় দিয়ে বললেন, “জগদ্ধাত্রী পুজো করলে তোদের ভাল হবে।”

আশাহত চিত্তে প্রসন্ন ফিরে গেলেন জয়রামবাটিতে।

* * *

খুব আনন্দের মধ্যেই জগদ্ধাত্রী পুজো হল। দেশসুদ্ধ সকলের ছিল পুজোয় নিমন্ত্রণ।

এক সময় সব আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। এবার এল দেবী-প্রতিমা বিসর্জনের লগ্ন।

সারদা-জননী মা জগদ্ধাত্রীর কানে কানে বললেন, “মা জগাই, আবার আর বছর এস।” পুনরাগমনায় চ।

এই প্রসঙ্গে মা সারদা বলছেন, “পরের বছর মা আমাকে বললেন, ‘দেখ, তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পুজো হবে।’ আমি বললুম, অত ল্যাঠা আমি পারব না। হল, একবার পুজো হল, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই, ও পারব না।”

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

মা সারদা বললেন, “তারপর একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি তিনজনে এসে হাজির। ওরে বাপ! সেই মনে পড়ছে। জগদ্ধাত্রী ও জয়া বিজয়া সখী।”

তিনজন একসঙ্গে মা সারদাকে প্রশ্ন করলেন, “আমরা তাহলে চলে যাব?”

উত্তরে মা সারদা বললেন, “কে তোমরা? না, না, তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলিনি।”

সেই থেকে জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হল। মা সারদা

পরবর্তীকালে বলছেন, "সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় এখানে (জয়রামবাটিতে) আসি।"

৺সিংহবাহিনীর আসন পাতা হয়েছিল যে পুণ্যভূমিতে, সেখানেই জন্ম নিলেন জননী সারদা। আর সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হল জগদম্বা জগদ্ধাত্রীর স্থায়ী পুজোর বেদি।

* * *

এত যে আয়োজন, এত যে সমারোহ—এরই মধ্যে মা সারদা আবার আক্রান্তা হলেন ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া এবং আমাশয়ের যুগপৎ আক্রমণে তাঁর শরীর তখন রীতিমত দুর্বল।

ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তাঁর প্লীহা গেল বেড়ে।

সেকালে প্লীহা বেড়ে গেলে দাগাতে হত। গ্রামাঞ্চলে অন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অনুসরণে (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৬৪) এই দাগানো ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে পারি।

এ ব্যাপারটা ছিল সেকালে এক বিকট গ্রাম্য চিকিৎসা। এতে আসল রোগের কোন উপশম হত কিনা কে জানে, কিন্তু এর প্রয়োগ-পদ্ধতি ছিল ভয়াবহ।

রোগীকে প্রথমে স্নান করানো হত। তারপর তাকে শুইয়ে তিন-চার জন লোক তার হাত পা চেপে ধরে থাকত, যাতে সে পালাতে না পারে।

এবার এক ব্যক্তি একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে পেটের উপর একটা জায়গায় ঘষত। এতে চামড়া পুড়ে যেত—রোগীও প্রাণপণে চিৎকার করত।

কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্লীহা দাগাতে কয়াপাটের হাটতলায় গিয়েছিলেন।

আর গিয়েছিলেন প্লীহায় আক্রান্ত জননী সারদা।

সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরী নিজেই মা সারদাকে সঙ্গে নিয়ে কয়াপাট-বদনগঞ্জে গিয়েছিলেন।

তাঁরা যখন হাটতলায় উপস্থিত হলেন, তখন সেখানকার শিবমন্দিরে

অন্য লোকের উপর ওই বিকট প্লীহা-চিকিৎসা চলছিল। মা সারদার কানেও এল রোগীদের বুকফাটা আর্তনাদ। তিনি দেখলেনও সব নিজের চোখে।

যথাসময়ে তাঁকে স্নান করতে বলা হল। তিনি স্নান করে এলে যথারীতি কয়েকজন এগিয়ে এল তাঁকেও চেপে ধরতে।

মা আপত্তি করলেন, বললেন, "না, কাউকে ধরতে হবে না, আমি নিজেই চুপ করে শুয়ে থাকব।"

তারপর সবাই অবাক হয়ে দেখল, সর্বংসহা ধরণীর মতই জননী সারদা নীরবে সেই দুঃসহ যন্ত্রণা প্রসন্নমুখেই সহ্য করলেন।

এই চিকিৎসার জন্যই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত তাঁর প্লীহা বৃদ্ধির প্রকোপটা প্রশমিত হল।

* * *

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বয়ং যিনি অবতার ঘরণী, যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দেবীজ্ঞানে পূজা করেছেন, তাঁর পক্ষে কি এইসব লৌকিক চিকিৎসা নিতান্তই বেমানান নয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেছেন: কথিত আছে যে, শ্রীভগবান বা তাঁর শক্তিবিশেষ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁরা প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ যুদ্ধ ঘোষণা না করে ঐগুলিকেই নবভাবে রূপায়িত করেন, কিংবা তাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, অথবা ওই সকল আপাতবিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যেও স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করে পথভ্রান্ত জনগণকে এক উচ্চতর আদর্শের দিকে টেনে নেন।

কে জানে, শ্রীমায়ের এই আচরণের পশ্চাতে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুকানো ছিল কিনা? তবে তিনি নিজেই বলেছেন "আদর্শ হিসাবে যা করতে হয়, তার ঢের বাড়া করেছি।"

আমরা এই আজকের যুগে বসেও সেদিনের কথা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই।

সেকালের কলকাতার ধনী পণ্ডিতদের শ্রদ্ধেয়া অবতাররূপে উপাসিত

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করেছেন, সর্বদা সর্বত্র যিনি ছিলেন সম্মানিতা, সেই অলৌকিক গুণাবলীর অধিকারিণী গ্রাম্য-কন্যা কখনও নিজের গৌরবে আত্মবিস্মৃত হননি, হননি শ্রদ্ধাহীন।

বরং আমরা দেখেছি, অশেষ বিনয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের তিনি প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন। সেইসঙ্গে গ্রাম্য দেবতাদের প্রতিও দেখিয়েছেন অধিকতর ভক্তি।

স্বামীর আর্থিক অবস্থা তখন অসচ্ছল না হলেও মা সারদা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য তাঁর কাছে কখনও টাকা পয়সা চেয়ে তাঁকে বিব্রত করেননি, করেননি দুঃখিত। পিত্রালয়ে থেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি অবিরাম ভোগ করেছেন রোগ যন্ত্রণা, তবু দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে জানাননি কোন প্রার্থনা বা আবেদন।

এমনকি স্বামী বিব্রত হবেন বা চিন্তান্বিত হবেন—এই আশঙ্কায় রোগজর্জর দেহ নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটিতে চলে এসেছেন। তিনি সকলকে আনন্দ দিয়েছেন, কিন্তু নিজে ভোগ করেছেন অসীম যন্ত্রণা।

মা সারদা যখন জয়রামবাটিতে এক কঠিন তপস্যা ও ব্রত পালন করে চলেছেন, তখন ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে সংঘটিত হচ্ছে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ জননী চন্দ্রমণি দেবী গঙ্গালাভের বাসনায় দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণের ওই নহবতেই থাকতেন, যেখানে এসে পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূ সারদা।

যে সময়ের কথা বলছি, সেটা ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস (বাংলা ১২৮২ সনের ফাল্গুন)। চন্দ্রমণির বয়স তখন ৮৫ বছর।

বয়সের ভারে এবং জরার আক্রমণে রত্নগর্ভা চন্দ্রমণি দেবীর ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তি তখন অনেকাংশে লুপ্ত।

মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁর জননীর কাছে যান এবং সেখানে কিছুক্ষণ থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের হাতে প্রতিদিনই জননীর যথাসাধ্য সেবা করেন। দিনের বেলায় "কালীর মা" নামে একজন সেবিকাও ওই বৃদ্ধার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আর সেবা করতেন হৃদয়ও।

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন হৃদয়কে চন্দ্রমণি দেবী সুনজরে দেখতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের অকালমৃত্যুর পর থেকেই বৃদ্ধার মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মেরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর আশঙ্কা, হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পুত্রবধূ সারদাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করছে।

তাই তিনি বারবার পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে সাবধান করে দিতেন, বলতেন, "হৃদুর কথা কখনও শুনবি না।"

বয়সের ভারে জরাজীর্ণা এই বৃদ্ধা দক্ষিণেশ্বর সন্নিহিত আলমবাজারের এক পাটকলের বাঁশি শুনে ভাবতেন, তিনি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি শুনছেন। দুপুরে পাটকলে কাজের বিরতি ঘোষণা করতে বাঁশি বাজত। চন্দ্রমণি দেবীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হত ওই শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে। তাই ওই বাঁশি না শুনলে তিনি নিজেও খেতেন না। যদি কেউ ওই বাঁশি বাজার আগেই তাঁকে খেতে বলতেন, তাহলে তাঁর মুখে ছিল সেই এক কথা, "এখন কি খাব গো, এখনও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয়নি। বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খেতে আছে?"

ওই পাটকলে যেদিন ছুটি থাকত সেদিন চন্দ্রমণি দেবীকে খেতে বসান ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয় নানারকম উপায় বার করে তাঁকে খাওয়াতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপার অনন্ত মাতৃভক্তির এক উজ্জ্বল অধ্যায় সেদিন রচিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে।

*   *   *

জরাজীর্ণ চন্দ্রমণি দেবীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থার দিনে দিনে অবনতি ঘটতে থাকে।

একদিন সকালে বেলা আটটা বেজে যাওয়ার পরও বৃদ্ধা ঘরের দরজা খুললেন না।

প্রতিদিনের মত কাজে এসে "কালীর মা" বদ্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পেলেন না। দরজায় কান পেতে শুনলেন, বৃদ্ধার কণ্ঠ থেকে একটা বিকৃত স্বর উঠছে।

এতে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন, ছুটে গেলেন হৃদয়ের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। সবাই এসে হাজির হলেন নহবতের সামনে। হৃদয় বাইরে থেকে ঘরের দরজা খুলতে না পেরে কৌশলে বাইরে থেকেই ভিতরের খিল খুলে ফেললেন। তারপর ঘরে ঢুকে দেখলেন, বৃদ্ধা জ্ঞান-হারা হয়ে শয্যায় শায়িতা।

হৃদয় ছুটে গিয়ে একটা কবিরাজি ওষুধ এনে বৃদ্ধার জিভে লাগিয়ে দিতে থাকেন। আর সেই সঙ্গে বিন্দু বিন্দু করে দুধ এবং গঙ্গাজল তাঁর মুখে দিতে শুরু করলেন।

এভাবেই তিনদিন তিনরাত্রি কেটে গেল।

অবশেষে উপস্থিত হল তাঁর অন্তিম সময়।

এবার তাঁকে অন্তর্জলি করা হল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ফুল, চন্দন ও তুলসী পাতা নিয়ে স্বীয় গর্ভধারিণীর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করলেন।

সেদিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি। আর সেদিনই বিদায় নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জননী। সেটা ১৮৭৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১২৮২ সনের ১৬ ফাল্গুন)।

সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চন্দ্রমণি দেবীর মরদেহের সৎকার করলেন। রামলালই বৃষোৎ-সর্গ শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন।

*   *   *

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যভূমিতে দেহরক্ষা করে চন্দ্রমণি দেবী যখন দেবীধামে

গমন করেন, তখন জননী সারদা কঠিন অসুখে আক্রান্ত।

চন্দ্রমণির দেহত্যাগের সংবাদ জয়রামবাটিতে আসতেই মা সারদা অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতে চান।

নিজের রুগ্ন ও দুর্বল শরীরের কথা ভুলে গেলেন তিনি। সব সময় তাঁর মনে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

এই দুর্বল ও অসুস্থ শরীর নিয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে কী করে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সম্ভব? এমন প্রশ্ন অনেকেই তুললেন। কিন্তু মা সারদা আর কোন কথা শুনতে রাজি নন।

দক্ষিণেশ্বরে তিনি যাবেনই।

কথামৃতকার মাস্টার মশাইয়ের (শ্রীম) দিনলিপি থেকে জানা যায়, দেহ কিছুটা সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা সারদা ১৮৭৬ সালের ১৭ মার্চ (বাংলা ১২৮২ সনের ৫ চৈত্র) দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন।

দক্ষিণেশ্বরে এই তাঁর তৃতীয় আগমন।

*   *   *

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে দ্বিতীয় রসদদার বলে চিহ্নিত করেছেন, সেই শম্ভু মল্লিকের কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পর পানিহাটিবাসী মণিমোহন সেন স্বেচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাবার ভার কিছুদিন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। তবে যে কোন কারণেই হোক তিনি বেশিদিন এই ভার বহন করতে পারেননি।

তারপরেই এলেন কলকাতা সিঁদুরিয়াপটির শম্ভুচরণ মল্লিক। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার পরই তিনি বিশেষ ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

দক্ষিণেশ্বরে আসার আগে শম্ভুবাবু ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্তিত ধর্মমতের বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং দান-ধ্যানের মাধ্যমে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন।

শম্ভুবাবু যতই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে থাকেন, ততই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতেন "গুরুজি"।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পাল্টা বলতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু।"

তবু মল্লিক মশাইয়ের সেই এক কথা, "আপনি আমার গুরুজি।"

যখনই যা প্রয়োজন হত, তখনই সেখানে তিনি হাজির। মা সারদা বা রামকৃষ্ণের সকল প্রয়োজন পূরণ করেই যেন তিনি ধন্য হতেন।

মল্লিক মশাইয়ের পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। মা সারদা যখনই দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, তখনই জয়মঙ্গলবারে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ষোড়শোপচারে তাঁর চরণপূজা করে পরিতৃপ্ত হতেন।

* * *

শম্ভুবাবুর মত একজন হৃদয়বান ভক্ত অতি সহজেই অনুধাবন করেছিলেন যে, গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে যার জীবন গড়ে উঠেছে, সেই মা সারদার পক্ষে নহবতের ওই ছোট্ট কুঠুরিতে বাস করা কতখানি কঠিন।

তাই, সারদামণি তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসার আগেই মন্দিরের কাছে কিছু জমি ২৫০ টাকা দিয়ে মৌরুসী করে নিলেন এবং সেই জমিতে একটা চালাঘর তৈরি করে দেবার ব্যবস্থাও করলেন।

সে সময় নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেন এবং দিনে দিনে রীতিমত ভক্তি ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তিনি যখন শুনলেন, শম্ভুবাবু মা সারদার জন্য একটি ঘর তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তখন তিনি বললেন, "ওই ঘর তৈরি করতে যত কাঠ লাগবে সব আমি দেব।"

নেপাল রাজসরকারের তখন ছিল মস্ত কাঠের কারবার। আর বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ছিলেন সেই কারবার পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত। কাজেই প্রয়োজনীয় কাঠের সরবরাহ করাটা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কষ্ট-

সাধ্য ছিল না।

নতুন জমিতে মা সারদার জন্য ঘর তৈরির কাজ শুরু হল।

কথামত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় বেলুড়ের কাঠগুদাম থেকে তিনখানি শাল কাঠের গুঁড়ি গঙ্গা দিয়ে ভাসিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় সেই তিনখানির মধ্যে একখানি জলের টানে ভেসে গেল।

এই ঘটনায় হৃদয় এমনই অসন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি মা সারদাকে "ভাগ্যহীনা" বলতেও দ্বিধা করেননি।

অবশ্য কাঠ ভেসে যাওয়ার খবর পেয়ে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় যথাসময়ে আরও একখানি কাঠ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশেষে সেই দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে সেই ভবতারিণী মন্দিরের কাছেই মা সারদার জন্য তৈরি হল সেই ঘর। অথবা বলা যায়, তৈরি হল এক মন্দিরের পাশেই আরেকটি মন্দির—যেখানে প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের জননী "জ্যান্ত দুর্গা"।

* * *

এই নতুন ঘরে মা সারদা এক বছরের মত ছিলেন। মায়ের সেবার জন্য একজন রমণীকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

নতুন এই আবাসে মা সারদাও যেন একটু স্বস্তি পেলেন, একটু আনন্দ পেলেন।

সকাল থেকেই তিনি মনের আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য রান্নাবান্নার কাজে হাত লাগান। নানারকমের জিনিস রান্না করে নিজে নিয়ে যেতেন মন্দিরে। তারপর সামনে বসে থেকে ঠাকুরকে ভোজন করিয়ে ফিরে আসতেন নিজের ঘরে।

কখনও কখনও দিনের বেলায় শ্রীরামকৃষ্ণও আসতেন এই ঘরে। তিনি জানতেন, এতে সারদা আনন্দ পাবেন। তাছাড়া তিনি নিজের চোখেও একবার দেখে নিতেন, মা এখানে কেমন আছেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

একদিন ঘটল অন্যরকম।

সেদিন বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন এই ঘরে—যেমন অন্তদিন আসেন। তিনি জানেন, অন্যদিনের মতই কিছুক্ষণ থেকে আবার মন্দিরে ফিরে যাব।

কিন্তু হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। একেবারে দিকবিদিক ঝাপসা করে মুষলধারে বৃষ্টি। বিরামহীন বৃষ্টি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল, তবু বৃষ্টি থামল না। একসময় সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি হল। রাতও বাড়তে থাকে। তবু বৃষ্টির বিরাম ঘটার কোন লক্ষণ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হলেন, তাইতো এরকম বৃষ্টি হলে তো মন্দিরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। মা সারদাও হলেন উদ্বিগ্ন।

শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ওই ঘরে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হলেন। আর মা সারদা পরম আনন্দে স্বামীকে ঝোলভাত রেঁধে ভোজন করান। রাত্রে শয্যাগ্রহণের সময় ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, "কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় না! এ যেন অমি তাই এসেছি।"

এই ঘরে মায়ের সঙ্গে থাকার জন্য হৃদয়ের পত্নীও এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন।

* * *

সে সময় বর্ষাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভীষণভাবে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন।

মা সারদা প্রথম প্রথম নিজের ঘর থেকে এসে ঠাকুরের সেবা ও যত্ন করতেন।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

কোথাও কিছু নেই, কোন চেনাজানাও নেই, হঠাৎই একদিন কাশী থেকে এক "প্রাচীন মেয়ে" এসে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। তিনি যেন দৈবনির্দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করতে সেখানে উপস্থিত হলেন।

এই "প্রাচীন মেয়ে" প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেছেন (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৭২): তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তিনি যেন দৈবনির্দেশেই অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝলকের মত

যুগাবতারের প্রয়োজনে কাশীধাম থেকে অকস্মাৎ তথায় আবির্ভূত হন ও সেবার পর্ব সম্পন্ন করে চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে যান।

মা সারদা পরবর্তীকালে যখন তীর্থদর্শনে কাশীতে গিয়েছিলেন, তখন বহু চেষ্টা করেও সেই "কাশীর মেয়ের" কোন সন্ধান পাননি।

এই কাশীর মেয়ে যখন বুঝলেন, কঠিন অসুখে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বিক সেবার ভার তাঁর একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়, তখনই তিনি সেই চালাঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মা সারদাকে তিনি বললেন, "মা, তাঁর (ঠাকুরের) এমন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে?"

সসঙ্কোচে মা উত্তর দিলেন, "কি করব, ভাগ্নেবউটি একা থাকবে! ভাগ্নে হৃদয় সেখানে ঠাকুরের কাছে রয়েছে।"

উত্তরে মেয়েটি বললেন, "তা হোক, ওরা লোকটোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে (ঠাকুরকে) ছেড়ে দূরে থাকা চলে?"

এবার মা সারদাও মেনে নিলেন মেয়েটির যুক্তি।

সেই চালাঘরের পাঠ তুলে দিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন নহবতে। তবে এবার তিনি একা—শাশুড়ি চন্দ্রমণি তখন ঈপ্সিত গঙ্গালাভ করেছেন।

নহবতে এসে তিনি পতিসেবায় দিবারাত্র আত্মনিয়োগ করলেন। সে এক কঠিন তপস্যা।

* * *

কাশীর এই মেয়েটি আরেকটি কাজ করেছিলেন।

মা সারদা এতকাল ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনও ঘোমটা খুলতেন না। এটা কাশীর মেয়েও লক্ষ্য করেছেন। তারপর একদিন রাত্রে তিনি মা সারদাকে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের কাছে এবং তারপর ঠাকুরের উপস্থিতিতেই মায়ের ঘোমটা খুলে দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদভাবে ছিলেন বিভোর। ছিলেন তন্ময়।

মা সারদা এবং কাশীর মেয়ে তাঁর সামনে গিয়ে বসতেই তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি যেন তখন অন্য মানুষ,

নতুন মানুষ।

মা সারদা এবং কাশীর মেয়ে এক অনাস্বাদিত রসের স্বাদ পেয়ে মুগ্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে থাকেন। তখন ভাবে বিভোর তাঁরা তিনজনই।

তাই, তাঁদের খেয়ালই ছিলনা, কখন রাত শেষ হয়ে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, তাঁরা লক্ষ্যই করেননি যে, পূর্বদিগন্তে সূর্যদেব ইতিমধ্যেই উঁকি দিয়েছেন।

এরকম আনন্দময় জীবনের স্বাদ মা সারদা বার বার লাভ করেছেন।

• • •

তারপর ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে (বাংলা ১২৮৩ সনের কার্তিক মাসে) তিনি আবার জয়রামবাটি ফিরে যান।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেলে কি হবে, তাঁর মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে।

পিতৃবিয়োগের পর জয়রামবাটির পিত্রালয়ে আর আগের মত শান্তির পরিবেশ নেই। এদিকে মায়ের নিজের শরীরও খুব দুর্বল— একটানা ম্যালেরিয়া আর আমাশয় রোগে ভুগে ভুগে শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

তবু তিনি নিজের কথা ভাবেন না। তিনি শুধু ভাবছেন, ঠাকুরকে গুরুতর অসুস্থ দেখে এসেছি, না জানি তিনি এখন কেমন আছেন।

তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন।

এই তাঁর চতুর্থবার আসা। কিন্তু এবারের আসাটা তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত চরম আশাভঙ্গের কারণ হয়েই দেখা দিয়েছিল। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আবার ফিরে

গিয়েছিলেন জয়রামবাটিতে।

সে কথা পরে বলছি।

১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে (বাংলা ১২৮৩ সালের মাঘ মাসে) মা সারদা চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

এবার তাঁর সঙ্গে এলেন সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরী এবং লক্ষ্মীদিদি।

* * *

অন্যপ্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এখানে লক্ষ্মীমণি দেবীর কথা একটু বলা প্রয়োজন। কারণ, মা সারদার দক্ষিণেশ্বর-অবস্থানের সঙ্গে লক্ষ্মীদিদির নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম সহোদর রামেশ্বরের দুই পুত্র ও এক কন্যা। দুই পুত্রের নাম রামলাল এবং শিবরাম। আর কন্যার নাম লক্ষ্মীমণি।

শুধু নামে নয়, রূপে ও গুণে তিনি ছিলেন সত্যিকারের লক্ষ্মী— যেমন কাঁচা সোনার মতই গায়ের রঙ, তেমনি তাঁর অন্তরও ছিল পবিত্রতা ও সরলতায় পরিপূর্ণ।

মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে শুধু যেন নিয়মরক্ষার জন্যেই। বিয়ের মাত্র দু'মাস পরেই তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ১২ বছর পরে প্রচলিত লোকাচার অনুসারে লক্ষ্মীদেবী নিজের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিধবার বেশ ধারণ করেন। পবিত্রতার প্রতীক যেন শুভ্র আবরণে হলেন স্বয়ং প্রকাশিতা।

স্বামী যদি ফিরে আসেন—সেই আশায় আশায় ১২ বছর ধরে যদিও তিনি শবরীর প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সে শুধু নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষাই, স্বামীর সংসার করার সাধ তাঁর কোনদিনই পূর্ণ হয়নি। তাই, শেষ পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি থেকে তাঁর প্রাপ্য অংশও তিনি গ্রহণ করেননি।

এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্মীমণির বিয়ে হওয়ার আগেই বলেছিলেন, "লক্ষ্মী হচ্ছে মা শীতলার অংশ। সাধারণ মানুষের ভোগে আসবে না, সে বিধবা

হবে। ভালই হবে, বাড়ির ঠাকুর দেবতার সেবাপূজা করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল।

মা সারদার তুলনায় লক্ষ্মীদিদি ছিলেন দশ বছরের ছোট। আর কামারপুকুরে বাল্যকাল থেকেই তিনি মায়ের সঙ্গিনী।

প্রথম থেকেই আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে তাঁর আকর্ষণ। সেবার কামারপুকুরে পশ্চিমাদেশ থেকে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। লক্ষ্মীদিদি তাঁর কাছেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

পরে তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জিহ্বায় রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র লিখে দেন এবং কানেও সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে শুনিয়ে দেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাঁরাই লক্ষ্মীদিদিকে দেখেছেন, তাঁরাই দেখেছেন এক সদা আনন্দময়ীকে। শুধু আনন্দময়ী নন, তিনি ছিলেন আনন্দদায়িনীও।

খুল্লতাত শ্রীরামকৃষ্ণের মতই গান ও কীর্তন করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। এছাড়া তিনি ভালো অভিনয় করতে পারতেন, করতে পারতেন দক্ষ অনুকরণ। পারতেন নৃত্য করতেও।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করার এমনই এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর, যা দেখে সকলেই চমৎকৃত হয়ে যেতেন।

নহবতের ওই ছোট্ট ঘরে লক্ষ্মীদিদিও অনেকবার মায়ের সঙ্গে থেকেছেন। আর প্রায়ই থাকতেন গৌরীমা যাঁর কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

এছাড়া গোপালের মা, ভাবিনী এবং গোলাপ মা এসেও মাঝে মাঝেই থাকতেন। আর আসতেন এবং কখনও কখনও থাকতেন যোগেন মা, বাগবাজারের বলরাম বসুর পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবী চুনীলাল বসুর পত্নী "অসীমের মা", কথামৃতকার শ্রীম' বা মাস্টার মশাইয়ের পত্নী নিকুঞ্জবালা দেবী, বঙ্কিম সেনের পত্নী প্রমুখ।

* * *

চতুর্থবার যখন মা দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন অনেক আশা ও ভরসা নিয়ে নিজের গর্ভধারিণী মা এবং লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে করে নিয়েই

এসেছিলেন।

আসার পথে শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে মা সারদা মানসিক করা নখ চুল দিয়ে এসেছিলেন। অসুখের সময় তিনি শিবের কাছে মানত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মায়ের সহোদর প্রসন্ন।

প্রথমে এসে তাঁরা গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায় প্রসন্ন নিজের বাসা করেছিলেন। সবাই গিয়ে উঠলেন সেখানেই।

পরদিন সকালে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতেই দেখা হল হৃদয়ের সঙ্গে। হৃদয়কে দেখে মা সারদা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিতা হলেন।

হৃদয়ের মুখে কিন্তু প্রসন্নতার ছায়ামাত্র ছিল না। সকলের দিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়েই হৃদয় হঠাৎ কী কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "কেন এসেছ? কি জন্যে এসেছ? এখানে কি?"

একটা চরম অশ্রদ্ধার ভাব তাঁর কথায় ফুটে ওঠে।

স্বীয় কন্যার সামনে অপমানিতা সারদা-জননী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন কথার কোন জবাব দিলেন না।

এই দুঃসহ ঘটনার উল্লেখ করে মা সারদা বলেছেন, "হৃদয় শিওড়ের লোক, আমার মাও শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে আদৌ মান্য করল না।"

অর্থাৎ, একই গ্রামের মানুষ হয়েও হৃদয় সারদা-জননীকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতে দেখে কোন কারণে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাঁর এই রুদ্রমূর্তি।

দুর্বিষহ অসম্মানে জর্জরিতা সারদা-জননী বললেন, "চল, ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে (সারদা) রেখে যাব?"

একথা বলার একটু কারণও ছিল। হৃদয় যখন এভাবে সকলকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত, সকলে যখন অসম্মানে ম্রিয়মান, তখন যাঁর কাছ থেকে সকলে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আশা করেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণও কোন কারণে ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। এই অপ্রত্যাশিত নীরবতা সকলের পক্ষে নীরবে সহ্য করাও সম্ভব ছিল না।

মা সারদা সেই দুঃখময় ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া কিছুই বলেননি। আমরা সকলে সেইদিনই চলে গেলুম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিল।"

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অনুসরণে জানতে পারি (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৭৩): মর্ম্মান্তিক বেদনা নিয়ে শ্রীমা বিদায় নিলেন—দক্ষিণেশ্বরে সেবারে একদিনও থাকা হল না। কিন্তু সে বেদনার জন্য স্বামীর উপর সতীলক্ষ্মীর কোন অভিমান হয়নি, ভাগিনেয় হৃদয়ের উপরও করুণাময়ীর কোন অভিশাপ বর্ষিত হয়নি। যা কিছু মান, অভিমান বা দুঃখ নিবেদন সবই ছিল সর্বকার্যের বিধাতা দেবতার কাছে।

তাই নতনয়নে বিদায়কালে মা সারদা মনে মনে মা কালীকে বললেন, "মা, যদি কোনদিন আনাও তো আসব।"

* * *

হৃদয় মিথ্যা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শুভাশুভ বিস্মৃত হয়েছিলেন। আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেললে মানুষের এই পরিণতিই হয়।

তাই সারদা-জননী এবং মা সারদাকে অপমানিত ও বিতাড়িত করে তিনি আত্মঅহংকারে মত্ত অবস্থায় আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন।

তিনি তখন জানতেনও না যে, অলক্ষ্যে অধিষ্ঠিত বিধাতাপুরুষ তাঁর এই অহঙ্কার মত্ততায় বিরূপ হয়ে উঠেছেন। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি বুঝতেও পারেননি যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থাই বিধাতার অদৃশ্য হস্ত সেই মুহূর্তে সম্পাদন করছিল।

এই প্রথম নয়। এর আগেও দক্ষিণেশ্বরে মা সারদাকে হৃদয় অসম্মান করেছিলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সতর্ক ও সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "ওরে, হৃদে, (নিজ দেহ দেখিয়ে) একে তুই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস ব'লে ওকে (সারদাকে) আর কখনও এমন কথা বলিস নি। এর (নিজের) ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"

সেদিন হৃদয়ের অহংকার-মত্ত মনে সে সতর্ক বাণী ক্ষণিকের জন্যও

 পাতা মুড়িবেন না।

কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তাই কি এবার শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব রয়ে গেলেন? তিনি বলেও যখন হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হলো না, তখন তিনি আর কিছু বলতে চাননি। চোখের সামনে পত্নী ও শাশুড়ির অসম্মান দেখেও নীরব ছিলেন। তিনি সবকিছু বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন মা ভবতারিণীর হাতে।

সেই মহাশক্তির বিচার শেষপর্যন্ত হয়ে পড়েছিল বড়ই কঠিন। আর তারই ফলে হৃদয়কে চিরদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। হৃদয়ের নির্বাসন দিয়ে মা সারদার আগমনের পথ আবার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন স্বয়ং মা ভবতারিণী।

সে কথাই বলছি।

বাংলা ১২৮৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস (ইংরেজি ১৮৮১ সাল)। মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যবাবু নিজের কন্যাকে নিয়ে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন মাতৃসন্দর্শনে।

হঠাৎ তিনি নিজের কন্যাকে দেখতে না পেয়ে সেখানে উপস্থিত মন্দিরের কর্মচারী ও লোকজনদের দ্রুত অনুসন্ধান করতে বললেন। একটু পরেই একজন এসে খবর দিল, হৃদয় সেই নিরুদ্দিষ্ট কন্যাকে একটি আসনে বসিয়ে কুমারীরূপে পূজা করছেন।

এতে ত্রৈলোক্যবাবু খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে মন্দির থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দিলেন।

হৃদয় নতমস্তকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। রামলাল দাদা ৺কালী-মন্দিরে পূজারীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে বছরই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ঐতিহাসিক কারণেই এই ঘটনাটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

* * *

যদিও এ যাত্রায় তিনি অপমানিতা হয়ে ফিরে গেলেন, তবে স্মরণ রাখতে হবে, দক্ষিণেশ্বরে মা সারদা যেন এক কঠিন তপস্যায় ব্রতী হতেই আসতেন। প্রমাণ করতে আসতেন, সংসার জীবন ও সাধনার পথ।

অল্প কিছু দিনের জন্য শম্ভু মল্লিক একটা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন

ঠিক কথা, কিন্তু অবশিষ্ট বেশিরভাগ সময়টা তিনি সেই নহবতখানার ছোট্ট কুঠুরির মধ্যেই অবস্থান করতেন।

তাঁর নিজের কথায় জানতে পারি, "ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলুম, তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হত। তারই ভিতর কতসব জিনিসপত্র।"

আবার বলছেন তিনি, "কখনও কখনও একাও ছিলুম।........মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরদাসী, এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হত—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হত না।"

শুধুই কি একা ঠাকুরের রান্না? মা সারদা বলছেন, "অপর সব ভক্তদেরও রান্না হত। লাটু ছিল; রামদত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে'।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য ছিলেন ওই বিহারী যুবক লাটু। পরবর্তীকালে ঠাকুরের কৃপায় তিনি হলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। এই লাটুকেই সবাই বলতেন "মিরাকল অব শ্রীরামকৃষ্ণ।" শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্ময়কর সৃষ্টি।

ওইটুকু ঘরের মধ্যে রান্নার আর বিরাম ছিল না। মা সারদার মুখেই শুনি সে কথা, "দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়ত রামদত্ত এল; গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব। আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন চার সের ময়দার রুটি হত। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হত। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত।"

নহবতের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মা সারদা বলছেন, "রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে (নহবতের) একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল।"

নহবতে থাকা মানে বনবাসে থাকা। সেকালে অনেকেই বলতেন, এ যুগের সীতা যেন নহবতের বনবাসে বন্দিনী। দোতলায় নহবত বসার

ব্যবস্থা। একতলায় ছোট একটা কুঠুরি। তাও আবার মালপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে।

মা বলছেন, "রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর শিকেয় ঝোলানো মাছের হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙ্গি মাছের ঝোল হত কিনা।"

সেখানে থাকার কষ্ট কত যে কঠিন ছিল, তা' জানা যায় মায়ের স্বমুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকেই, "শৌচের আর নাওয়ার জন্যই যা কষ্ট হত। বেগ ধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধরে গিয়েছিল।...... দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম—গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম, 'হরি, হরি,' একবার শৌচে যেতে পারতুম।"

দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসত মেছুনীরা। মা বলছেন, "আর ঐ মেছুনীরা ছিল আমার সঙ্গী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম।"

*　　*　　*

নহবতে থাকাকালীন মায়ের দৈনন্দিন জীবন-ধারা সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি যোগীন মা কথিত বিবরণ থেকে।

এখানে এই যোগীন মা (যোগেন মা) সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

যোগীন মা'র আসল নাম যোগীন্দ্রমোহিনী। খড়দহের বিখ্যাত বিশ্বাস বংশের বধূ। তাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ি আর্থিক দিক থেকে খুবই সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল।

কিন্তু তবু তাঁর জীবনে নেমে আসে দুঃখের অমানিশা। সব থেকেও পতি যার আপন হল না, সেই নারীর জীবনে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? যোগীন্দ্রমোহিনীর জীবনে ঘটল তাই।

শুধু তাই নয়, তাঁর একমাত্র পুত্র শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে, একমাত্র কন্যাও অল্প বয়সেই মারা যায়। ফলে সংসারের বন্ধন বলতে তাঁর আর কিছুই ছিল না।

তবু তিনি পতির প্রতি কোনদিন বিরূপ হননি। পতির যাবতীয় দুর্ব্যবহার ভুলে গিয়ে তিনি পতিসেবা করতে প্রয়াসী ছিলেন। বাগবাজারে বাপের বাড়ীতেই থাকতেন এবং সেখানে থেকেই বিপথগামী পতিকে ধর্মপথে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে সেই উপদেশই দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "পতির আচরণ যেরূপই হোক না কেন, সাধ্বী নারীর কর্তব্য পতির সেবাযত্ন করা এবং স্বামীকে ধর্মপথে আনার চেষ্টা করা।"

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর ও মা সারদার নিকট সংস্পর্শে এসে তিনি সাংসারিক অশান্তির আবিলতা দূরে ঠেলে ভগবৎ চিন্তায় নতুন আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন। অপার করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পিত্রালয়ে (বাগবাজারে) পদার্পণ করে যোগীন্দ্রমোহিনীর তাপিত জীবনকে ধন্য করেছিলেন।

* * *

নহবতে মা সারদার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে যোগীন মা বলছেন, "শ্রীমা ভোর চারটার আগে শৌচ ও স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন—ঠাকুর ধ্যান করতে বলতেন কিনা! এরপরে বাকি কাজকর্ম সেরে পূজায় বসতেন। পূজা, জপ, ধ্যান—এতে প্রায় দেড়-ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর সিঁড়ির নিচে রান্না করতে বসতেন। রান্না হলে যেদিন সুযোগ ঘটত, সেদিন মা নিজ হাতে ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখিয়ে দিতেন। সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ঠাকুর আহার করতেন। তিনি স্নানে যেতেন মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে নজর রাখতেন ঠাকুর স্নান করে ফিরে এল কিনা। তিনি (ঠাকুর) তাঁর ঘরে এলেই মা এসে জল ও আসন দিয়ে তার পরে খাবারের থালা নিয়ে এসে তাঁকে আহারে বসিয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিঘ্ন না ঘটায়।"

এক্ষেত্রে স্মরনীয়, অনেক সময় খেতে বসেও ঠাকুরের ভাবসমাধি হত। একমাত্র মা সারদাই খাবার সময় সেই ভাবসমাধি ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। আর কারও সাধ্য ছিলনা।

যোগীন মা কথিত অন্তরঙ্গ বিবরণ থেকে আমরা আরও জানতে

পারি, "ঠাকুরের খাওয়া হলে মা একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন। পরে পান সাজতে বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন করে গান গাইতেন , তা' খুব সাবধানে, যেন কেউ শুনতে না পায়।"

যোগীন মা পুণ্য স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন, এর পরে কলের সেই একটার বাঁশি বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের মা বৃন্দাবনে (বৈকুণ্ঠে) কৃষ্ণের বাঁশি বলতেন, তাই শুনে মা সারদা খেতে বসতেন। সুতরাং দেড়টা দু'টোর আগে কোনদিনই মায়ের খাওয়া হত না। আহারের পরে নামমাত্র একটু বিশ্রাম করে সিঁড়িতে চুল শুকোতে বসতেন তিনটে নাগাদ।

সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। সব কাজ হাসিমুখে সারতেন তিনি। কাজে আনন্দ, আনন্দের মধ্য দিয়েই ছিল তাঁর কাজ।

চুল শুকিয়েই আবার কাজে হাত লাগাতেন। সন্ধ্যা নামার আগেই আলোটালোগুলি সব ঠিক করে রাখতেন। তারপর তোলা জলে কোনরকমে মুখহাত ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হতেন।

যোগীন মা দেখেছেন, "সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুর দেবতার সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। এরপরে রাত্রের রান্না; সকলকে খাওয়ানো সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু বিশ্রাম করে ওঠে পড়তেন।"

একদিন অন্ধকারে স্নান করতে গঙ্গায় গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন তিনি, হঠাৎ পা পড়ল কিসের ওপর। সেই অন্ধকারে পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি, একটা কুমির সেই সিঁড়ির ওপর শুয়ে ছিল। তিনি তারই ওপর প্রায় পা দিয়েই ফেলেছেন। মায়ের পদশব্দে কুমিরটাও ভয় পেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর থেকে আলো না নিয়ে সন্ধ্যার পর আর কোনদিন তিনি গঙ্গায় যাননি।

এখন আর হৃদয় সেই। রামলাল দাদাই হলেন মন্দিরের পূজারী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম সহোদর রামেশ্বরের পুত্র, লক্ষ্মীমনির অগ্রজ।'

এই পদোন্নতিতে তাঁর অহঙ্কার আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠল। তিনিও অতি সহজেই আত্মবিস্মৃত হলেন।

রামলাল দাদা ভাবতে শুরু করলেন, "আর কি, এবার মা কালীর পূজারী হয়েছি!" অর্থাৎ, আমাকে আর পায় কে?

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দেখাশোনা করার ব্যাপারে আর মোটেই উৎসাহী বা আগ্রহী ছিলেন না।

অথচ সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ অবিরাম সমাধিমগ্ন থাকতেন। যখন তখন তাঁর সমাধি হত। এই অবস্থায় কেউ যদি যত্ন না করত, কেউ যদি যত্ন করে না খাওয়াত, তাহলে হয়ত তাঁর খাওয়াই হত না।

এমন দিনও গেছে, মা কালীর প্রসাদ ঘরে পড়ে থেকে থেকে শুকিয়ে গেছে, অথচ তাঁর খাওয়া হয়নি।

সে সময় দক্ষিণেশ্বরে এমন আর কেউ ছিলেন না, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দেখাশোনা করার ভার নিতে পারেন। তাঁর খাওয়া -দাওয়ার ব্যাপারেও দেখা দিল চরম অসুবিধা। আপন ভেবে তাঁর সেবা করার কেউ ছিল না সেদিন।

তাই, যদি কোন লোক জয়রাবাটি বা কামারপুকুর যেত, ঠাকুর তাঁর মাধ্যমেই মা সারদাকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য খবর পাঠাতেন।

ঠাকুর মাকে বলে পাঠাতেন, "এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে বামুনদের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে—ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক-আমি দেব।"

এমন আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কি মা সারদা দূরে

থাকতে পারেন? তাঁরই প্রেমের ঠাকুর, তারই জীবন-ধন চরম অসুবিধার মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে দিন কাটাবেন—এ খবর পেয়েই তিনি ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরের পানে।

এবার এলেন একবছর পরে।

১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (বাংলা ১২৮৮ সনের ফাল্গুন মাসে) তিনি পঞ্চমবারের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

* * *

যদিও নির্দিষ্ট ভাবে মা সারদার মোট আটবার দক্ষিণেশ্বরে আসার বৃত্তান্ত পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়, তবু কিন্তু এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে, ওই আটবারের বাইরে মা সারদা অন্য কখনও দক্ষিণেশ্বরে আসেননি। হয়ত সেসব বৃত্তান্ত যথাযথভাবে লিখিত হয়নি বলে রয়ে গেছে সাধারণের অগোচরে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৭৫), সাধনকালের অবসান থেকে বাংলা ১২৮৭ সন পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছর শ্রীশ্রীঠাকুর চাতুর্মাস্যের সময় দেশে যেতেন, তখন শ্রীমাও সম্ভবত সঙ্গে থাকতেন। সাধনকালে অনিয়মাদিবশত ঠাকুরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সুতরাং পল্লীগ্রামের মুক্ত বাতাস ও স্বচ্ছন্দ আহার-বিহারে দেহের উন্নতি হবে বলে চিকিৎসকগণ তাঁকে ওই সময় দেশে যেতে পরামর্শ দিতেন। ঘাটাল পর্যন্ত ষ্টিমার চলাচল আরম্ভ হলে তিনি শ্রীমা ও হৃদয়কে নিয়ে একবার ওই পথে দেশে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণে এমন কথাই মনে হয় যে, বাংলা ১২৮৩ সন থেকে পর পর তিনবছর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। সাধারণতঃ স্নানযাত্রার পরে পঞ্চমীর দিন তিনি দেশে যেতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতেন দুর্গাপূজার আগেই।

* * *

আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগের ঘটনা। সেটা ছিল ১৮৮৫ সাল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন পঞ্চবটী থেকে একটি

সংকীর্তন তরঙ্গ বকুলতলার দিকে আসছে, বকুলতলা থেকে বাঁক নিয়ে কালী বাড়ির প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছে, শেষে গাছের আড়ালে অন্তর্হিত হচ্ছে।

এই দর্শনের কিছুকাল 'পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মা সারদা এবং ভাগনে হৃদয়রাম।

সেদিনের সেই ঘটনার বর্ণনা আমরা বিভিন্ন বইপত্রে পাই। আর সে-সবকিছুর সমাহারে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল "বিশ্ববানী" পত্রিকার ১৩৮৮ সনের পূজা সংখ্যায়। প্রবন্ধটির নাম "বালী-দেওয়ানগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ।" লেখক স্বামী প্রভানন্দ। অক্ষয়-কুমার সেনের" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতেও (পৃঃ ২১৫) এই ঘটনার বর্ণনা আছে।

যে সময় কলকাতা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত স্টিমার চলাচল করতে শুরু করেছে। সেবার শ্রীরামকৃষ্ণ কোন পথে গিয়েছিলেন ?

এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, শ্রী রামকৃষ্ণ কলকাতা থেকে স্টিমারে কোলাঘাট যান। কোলাঘাট থেকে যান রাণীচক। সেখান থেকে নৌকায় যান বালী দেওয়ানগঞ্জে।

আবার অন্যরা বলেন, না, শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা থেকে নৌকায় ঘাটাল যান। সেখান থেকে বালী দেওয়ানগঞ্জে। এই বালী দেওয়ান-গঞ্জ থেকে হাঁটা পথে বা পাল্কিতে কামারপুকুর।

স্বামী প্রভানন্দের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, হৃদয়রাম নাকি পরবর্তী-কালে মাষ্টারমশাইকে বলেছিলেন যে, তাঁরা নৌকা করেই গিয়েছিলেন। নৌকায় ভাড়া পড়েছিল দশ টাকা। এই তথ্য নাকি মাষ্টারমশাই (শ্রীম) তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকা করেই যে গিয়েছিলেন, সেটা অন্যান্য সূত্র থেকে সমর্থিত হয়। তাঁদের মতে, নৌকা হুগলী নদী দিয়ে এসে গেয়োখালিতে রূপনারায়ণে ঢুকেছিল। তারপর সেই নৌকা কোলাঘাট হয়ে সোজা গিয়েছিল বন্দরে। সেখান থেকে শিলাবতী নদী ঘাটাল হয়ে চলে গেছে। নৌকাটি দ্বারকেশ্বর নদ দিয়ে বালী দেওয়ানগঞ্জে গিয়েছিল।

এই বালি ও দেওয়ানগঞ্জ সে সময়কার দুই সমৃদ্ধ ও উন্নত জনপদ। আরামবাগ শহর পেরিয়ে দ্বারকেশ্বরের উপর এখন সুন্দর সেতু তৈরি হয়েছে। সেই সেতু ছাড়িয়ে কামারপুকুরের দিকে এগোতে গেলেই পড়বে কালীপুরের মোড়। সেখানেই বাঁ হাতে সরু পিচের রাস্তাটা কিছুদূর এগিয়ে কাঁচা রাস্তায় রূপান্তরিত। এই রাস্তাটা মাঠের উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে দ্বারকেশ্বরের সমান্তরালে পৌঁছে গেছে বালী দেওয়ানগঞ্জ।

এই অঞ্চলে বন্যা প্রায় প্রতিবছরের ব্যাপার। তবে ১৮৩৩, ১৮৪৫ ১৯৫৯ এবং ১৯৭৮ সালের বন্যায় সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর সর্বনাশ।

১৯৭৮ সালের বন্যার পর রামকৃষ্ণ মিশন ওই অঞ্চলে বন্যায় গৃহহীন মানুষের জন্য নতুন নতুন গ্রাম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অভয় বাড়ি, নিশ্চিন্ত নীড় ইত্যাদি চারটি নতুন গ্রাম তৈরি হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমিও সেই বিরাট কর্মযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বার চারেক ওই অঞ্চলে ঘুরেছি। তখনই দেখছি মন্দিরময় বালী দেওয়ানগঞ্জের ম্রিয়মান প্রাচীন ঐতিহ্যের সমারোহ।

এতটা পথ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মা সারদা নৌকায় গিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনে এক পবিত্র স্মৃতি। পরবর্তীকালে তিনি মাষ্টার-মশাইয়ের পত্নী নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেন: একসঙ্গে এক নৌকায় বালি হয়ে দেশে যাওয়া —একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পর প্রসাদ পাওয়া।

কথায় কথায় সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মা সারদাকে বলেছিলেন: আমি জানি তুমি কে, কিন্তু এখন বলব না।

আবার তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলেছিলেন: এর ভিতর সব আছে। (স্বামী প্রভানন্দের প্রবন্ধ)

দেওয়ানগঞ্জে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে নিয়ে এসে নৌকা থেকে নামলেন, তখন, "ঝরে মেঘ ঝুরু ঝুরু দিবা অবসান।" তখন প্রায় দিনের শেষ। অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

আগেই বলেছি, দেওয়ানগঞ্জ একটা বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। অতীত

ঐতিহ্য বজায় রেখে এখনও সেখানে কাসা-পিতলের বাসন পত্র, রেশম তসরের সঙ্গে তুলো মিশিয়ে রঙ্গিমা এবং তসরের কাপড় তৈরি হয়। দেওয়ানগঞ্জ থেকে বালি হাট প্রায় দুই কিলোমিটার। বালি হচ্ছে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে।

*　　　*　　　*

সেখানে তখন প্রবল বর্ষণ। ওদিকে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। মা সারদাকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এখন কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি অনুসরণে জানতে পারি: "হৃদয় ভাগিনা করে বাসার সন্ধান।"

এই গ্রামেই বাস করত এক ভক্তি-প্রাণ মোদক পরিবার। এই পরিবারের কর্তা বংশীধর ও তাঁর স্ত্রী গিরিবালা ওই অঞ্চলে নিজেদের চরিত্র মাধুর্যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

এই বংশীধরের প্রপৌত্র দুলাল মোদক একটা সাইকেল মেরামতের দোকান করেছেন। আর তাঁর মা'র কাছে এখনও শোনা যায় পুরানো দিনের সেইসব সুখ স্মৃতির কথা।

বংশীধর নিজের বসবাসের জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তাঁর বাসনা, ওই নতুন বাড়িতে নিজে ঢোকার আগে একজন সাধু বা সজ্জনকে ওই বাড়িতে তিন দিন রেখে সেবা করবেন।

বংশীধর যখন ওই বাসনা মনে মনে পোষণ করে একজন সাধু বা সজ্জনের পথ চেয়ে বসে আছেন, সেই অনাগত মহাজনের আগমন প্রতীক্ষায় নতুন বাড়ির দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, ঠিক তখনই দেওয়ানগঞ্জ বাজারে হৃদয়রাম তাঁর মামা-মামীর জন্য আকুল হয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন।

শেষপর্যন্ত এর কাছে তার কাছে খুঁজতে খুঁজতে হৃদয় এলেন বংশীধরের কাছে। বংশীধরও শুনলেন সব, মনে মনে ভাবলেন, তবে কি এই সেই সাধুজন, যার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

হৃদয়ের মুখে শুনলেন সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণের পরিচয়। তিনি এই ব্রাহ্মণকে চেনেন না, দেখেনও নি কোনদিন, তবু তাঁর মন বলছে,

"এতদিনে ঠিক লোকের সন্ধান পেয়েছি।"

অক্ষয়কুমার সেন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে" লিখেছেন (পৃঃ ২১৫)

(হৃদয়) "ভক্তিমান ময়রার কাছে এস পরে।
সৌভাগ্য-উদয় মহাসমাদর করে॥
পরিচয় পাইয়া (ময়রা) প্রণত বারবার।
বাসা দিল নূতন আবাসে আপনার॥"

* * *

"জানেনা মোদক এঁরা বটে কোন জন।
কেবা সেবাপব হৃত্ আত্মীয় স্বজন॥
পাইয়াও নাহি পায়, দেখেও না দেখে,
লীলা নিত্য উভয়েই ইন্দ্রিয়ে না ঢুকে॥"

যদিও বংশীধর এঁদের চেনেন না, চেনেন না এই নতুন অতিথিদের, তবু কিন্তু প্রথম দর্শনেই তিনি বিমোহিত হয়ে পড়েন। এঁরা যেন তাঁর কতদিনের চেনা, কতকালের জানা।

তিনি পরম সমাদরে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও হৃদয়কে নিয়ে এলেন নিজের নতুন বাড়িতে। এমন অতিথি লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন।

এই নতুন বাড়িতে সেই দুর্যোগের বিকেলে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা এবং হৃদয়রাম এসে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। "গর্জিয়া ঝরিছে মেঘ, বৃষ্টি নাহি মানে।" প্রবল বর্ষণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ ওই নতুন বাড়িতে রাত্রি-বাসের সিদ্ধান্ত নিলেন।

এতে বংশীধরের আনন্দ আর ধরে না। এই ব্রাহ্মণ দম্পতির জন্য "সিধার" আয়োজন করতে তিনি এখানে ওখানে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ছুটোছুটি করতে থাকেন।

একে পাড়াগাঁ, তার উপর এই দুর্যোগ। খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করা খুবই কঠিন। তবু বংশীধর দ্বিগুণ দাম দিয়ে সব জোগাড় করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করে ধন্য হলেন।

পরদিন সকাল থেকেও সেই বৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাদ গুণলেন, বৃষ্টি না থামলে কামারপুকুর যাবেন কিভাবে ?

ওদিকে বংশীধর ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন : প্রভু, এ বৃষ্টি যেন সহজে না থামে। বৃষ্টি থামলেই যে প্রভু চলে যাবেন।

উদ্বিগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদা সেই নতুন বাড়িতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বংশীধর দূরে বসে অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় তখন তাঁর পরম আনন্দ।

এভাবেই ভক্তের কাছে ভগবান ধরা দিলেন।

প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ওই বাড়িতে তিন রাত্রি বাস করলেন।

এদিকে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। শিক্ষিতজনের কাছে তখন তিনি মথুরবাবুর গুরু, কেশবচন্দ্রেরও গুরু। আর সাধারণের কাছে তিনি হলেন, দক্ষিণেশ্বরে রানীরাসমণির বিরাট মন্দিরের পূজারী। কেউ কেউ তাঁকে পরমহংসদেব বলেও জানেন।

তাই অনেকে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনতে।

ওই অঞ্চল ছিল বৈষ্ণবপ্রধান। প্রধান গোঁসাইরাও এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ব্যবহার, কথা আর গান শুনে সকলে মোহিত। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন :

যত লোক গ'লে প'ড়ে প্রভুর কথায়।
কেহ নাচে, কেহ হরিগুণ গীত গায়।
হয়েছে আনন্দময় মোদক ভবন।
দিনে রাতে পরিপূর্ণ আছে লোকজন ॥

তারপর চতুর্থ দিনে আকাশ পরিষ্কার হল।

কিন্তু বংশীধরের মুখমণ্ডলে জমে উঠল বিষাদের মেঘ, চোখ থেকে বুকে নেমে এল অশ্রুধারা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি বিদায় দেবেন কিভাবে ?

তবু দিতে হল।

তারপর বংশীধর ওই নতুন ঘরে আবার তালা ঝুলিয়ে দিলেন, বললেন, "যে ঘরে আমার প্রভু তিন রাত্রি বাস করেছেন, যে ঘরে আমার মা তিন রাত্রি অতিবাহিত করেছেন, সে তো আর সাধারণ ঘর নেই, সে যে মন্দির হয়ে গেছে। সেখানে আমি বাস করব কেমন করে?"

এসব কাহিনী বালি দেওয়ানগঞ্জে লোকমুখে প্রচারিত। বংশীধরের প্রপৌত্র ছুলাল মোদক এবং তাঁর বৃদ্ধা মা অতীতের সেই সুখস্মৃতির বাহক।

১৯১৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দ্বারকেশ্বর নদের দুই তীরে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে বংশীধরের সেই ঘরটিও ধ্বংস হয়ে যায়। বেলুড়মঠ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় সন্ন্যাসীরা ওই অঞ্চলে গৃহহীনদের জন্য নতুন চারটি গ্রাম তৈরী করে দেন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতিপূত ঘরটিও নতুন করে তৈরী করে দেন।

বর্তমান লেখকও সেই সূত্রে বার চারেক ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এবং নিজেই বালি-দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের বিস্মৃত প্রায় সেই পুণ্যকাহিনীর সূত্র সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জয়রামবটিতেও বহুবার গেছেন। কিন্তু কতবার যে গেছেন বা কবে কবে গেছেন, সে সম্পর্কে সন তারিখ মিলিয়ে সঠিক কোন হিসেব পাওয়া যায় না। হিসেব যতটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু যে সম্পূর্ণ নয়, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

কামারপুকুরে গেলেই তাঁকে শিহরে নিয়ে যাওয়া হত। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেছেন (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৭৬): ঐ সময় পথে জয়রামবাটিতে কোন কোন বার তিনি আট দশ দিনও থেকেছেন।

তাঁর দেওয়া বিবরণ থেকেই জানতে পারি, একবার শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের হঠাৎ খুব ক্ষুধাবোধ হল। তখন অন্য সকলেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যরাত্রে উঠে বসলেন, বললেন, "বড় ক্ষুধা পেয়েছে।"

মা সারদা হয়ে পড়লেন বিব্রত, এখন কি করবেন। সেদিন জয়রামবাটিতে মায়ের পিতৃগৃহে কোন এক বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিত এসেছিলেন। যা কিছু রান্নাবান্না হয়েছিল সব শেষ। ঠাকুরকে দেওয়ার মত ঘরে কিছুই নেই।

বাড়ির সকলে ভেবেই পেলেন না কী করবেন, তবে ভাতের হাঁড়িতে কিছুটা পান্তা ভাত ছিল। তা কি আর জামাইকে দেওয়া যায়?

তবু মা সারদা ভয়ে ভয়ে ঠাকুরকে সেই পান্তার কথা বললেন।

শুনেই তিনি বললেন, "বেশ তো, তাই নিয়ে এস।"

এবার মা সারদা বললেন, "কিন্তু কোন তরকারি তো নেই।" মাকে উৎসাহ দিয়ে ঠাকুর বললেন, "দেখ না খুঁজে পেতে ; তোমরা মাছ চাটুই করেছিলে তো? দেখনা তার একটু আছে কিনা।"

শেষ পর্যন্ত তারই একটু অবশিষ্ট পাওয়া গেল। তাতেই ঠাকুরের কী আনন্দ। পরম পরিতৃপ্তিতে পান্তাভাত খেয়ে তিনি শান্ত হলেন।

* * *

মা সারদাকে ইতিপূর্বে যখনই আমরা কামারপুকুর বা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে দেখেছি, তখনই দেখেছি তাঁর নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি। কখনও তাঁর শাশুড়ি, কখনও ভৈরবী ব্রাহ্মণী, কখনও মধ্যমা জা, অথবা কখনও ভাগিনেয় হৃদয় তাঁর গতিবিধির উপর এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতেন।

তার ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যত নিবিড়ই হোক না কেন, তার বাহ্যিক প্রকাশে ছিল কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য যেন দূর হতে থাকে, সঙ্কোচ যেন হতে থাকে শিথিল—অথচ সেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন উদ্বেলতা নেই।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ওই ছোট ঘরে তিনি যেন সীতার মতই বন্দিনী জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কোন ক্লেশ নেই, কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "তবু আর কোনও কষ্ট জানিনি।......... তাঁর সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।"

এই তপস্যাঘন জীবনে তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন গৌরীমা—যার কথা এখানে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

*　　　*　　　*

গৌরীমা ছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কন্যা। দক্ষিণেশ্বরের কাছেই নিমতা-ঘোলা গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি বাল্যকালেই দীক্ষালাভ করেন।

আর এই বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন "অতিশয় ভগবত ভক্তিপরায়না এবং কৌমারব্রত ধারিণী।" সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি দীর্ঘদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান এবং একটানা বহু বছর কঠিন তপস্যায় আত্মমগ্ন ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা বলতেন, শ্রীযুক্তা গৌরী দিদিমণি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্যা। ইনি নিজ হাতে রান্না করে ঠাকুরকে ভোজন করাতেন। ঠাকুর তাতে প্রসন্ন হতেন। নহবতে বসে তাঁর সুকণ্ঠের গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হতেন। এসব তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। ঠাকুর বলেছেন, গৌরী মহাতপস্বিনী এবং মহাভাগ্যবতীও পুণ্যবতী (দুর্গাপুরী দেবী রচিত "সারদা রামকৃষ্ণ", পৃঃ ১১০)।

তীর্থ পরিক্রমা শেষ করে গৌরীমা আবার যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। সেটা বাংলা ১২৮৯ সালের ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই গৌরীমাকে নিয়ে গেলেন মা সারদার কাছে, বললেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।"

*　　　*　　　*

আর ছিলেন গোপালের মা। আসল নাম অঘোরমণি।

দক্ষিণেশ্বরের কাছেই কামারহাটি গ্রামের এক দেবালয়ে তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা ব্রাহ্মণ ঘরের বাল্যবিধবা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে একদিন এসেছিলেন পরমহংসদেবকে দর্শন করতে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দিয়েছিলেন সন্দেশ প্রসাদ। তিনি কিন্তু সেই প্রসাদ নিজে না গ্রহণ করে অন্যকে দিয়েছিলেন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন "শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ" কৈবর্ত্য বাড়ির পুরোহিত। ব্রাহ্মণ বিধবা সেই সন্দেশ খাবেন কি করে?

কিন্তু ধীরে ধীরে প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমের স্পর্শে তাঁর সংস্কার দূরীভূত হল। ঠাকুরকে তিনি শয়নে স্বপনে দেখতে শুরু করলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর আরাধ্যদেবতা গোপাল।

গোপালের মা সম্পর্কে মা সারদারও ছিল অপার ভালোবাসা। তিনি বলতেন, "ঠাকুরকে আর আমাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে বৃদ্ধা স্বর্গসুখ পেতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বলে বলে আমাকে দিয়ে অনেকরকম রাঁধাতেন।"

মা সারদা অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাওয়াতে পারতেন না। তখন গোপালের মা-ই যেতেন। নিজে ঠাকুরের কাছে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করতেন, কত স্নেহ করে খাওয়াতেন, বলতেন, "ও গোপাল, তুমি ভালো করে খাও বাবা।"

এই গোপালের মা ছিলেন মা সারদার দক্ষিণেশ্বর জীবনের আরেক-জন স্নেহময়ী সঙ্গিনী।

* * *

আর ছিলেন গোলাপ মা। তিনিও ব্রাহ্মণ বিধবা। একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতেই তাঁর জীবন হতাশা-দীর্ণ হয়ে পড়ে।

তার উপর তাঁর অতিসুন্দরী একমাত্র কন্যা চণ্ডীকে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের সর্বস্ব খুইয়ে। সে মেয়ে নিজেও

সুখী হল না, মাকেও সুখ দিল না। অকালেই মেয়েটিও চিরতরে বিদায় নিল।

শোকে-দুঃখে যখন গোলাপ মা পাথর প্রতিমা, তখনই একদিন যোগেন মা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এলেন। নিয়ে গেলেন নহবতে মা সারদার কাছেও।

সন্তাপহারিনী মা এক মুহূর্তে "কন্যাকে" বুকে টেনে নিলেন, হরণ করলেন সব শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রনা।

গোলাপ মা পেলেন নতুন সুখের সন্ধান।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে তিনি থাকতেন উত্তর কলকাতায়। সেখান থেকে প্রায়ই ছুটে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার সেবা করে কৃতার্থ বোধ করতেন।

পরম করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণও একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিলেন গোলাপ মায়ের বাড়িতে। অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে আনন্দ বিহ্বল গোলাপ মা সেদিন বলে উঠেছিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না।"

ভক্ত-ভগবানের সে এক মধুর লীলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে মা সারদা বলতেন, "কি মানুষই এসেছিলেন! কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল! কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি, কথা, গল্প, কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত।"

দক্ষিণেশ্বরে এক বুড়ী আসত মায়ের কাছে। এই বুড়ী পূর্বজীবনে নাকি অসতী ছিল। এখন বৃদ্ধা। সবসময় হরিনাম করে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ওই বুড়ীকে দেখে মা সারদাকে বললেন, "ওটা কে এখানে কেন?"

মা বললেন, "ও এখন ভালো কথাই'তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কি ? মানুষের তো আর মনে সব সময় পূর্বভাব থাকে না।"

তবু শ্রীরামকৃষ্ণ ওই বুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করলেন। মা পরবর্তীকালে বলছেন, "পাছে কুবুদ্ধি শিখায় এই ভয়ে তিনি ওসব লোকদের সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতে নিষেধ করতেন। এত করে আমাকে রক্ষা করতেন।"

দক্ষিণেশ্বরের জীবন প্রসঙ্গে মা সারদা কত কথাই বলতেন, কত সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করতেন। সারদা বলতেন, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন ! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। তিনি আমাকে কখনও "তুই" পর্যন্ত বলেন নি।"

একদিনের একটি বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন, "দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবার দিতে গেছি, (খাবার) রেখে চলে আসছি ; তিনি লক্ষ্মী খাবার দিয়ে গেল মনে করে বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। আমি বললুম, হাঁ, দরজা ভেজিয়ে রাখলুম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদার গলার স্বর টের পেয়ে সংকুচিত হয়ে বললেন, 'আহা, তুমি ! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—কিছু মনে করো না।'

"দিয়ে যাস" বলেছিলেন, তার জন্যই এই সংকোচ।

পরদিন সকালে নহবতের সামনে দাঁড়িয়ে আবার বলছেন, "দেখগো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ়বাক্য বললুম।"

মা সারদা বলতেন, ঠাকুর কখনও আমাকে "তুমি" ছাড়া "তুই" বলেন নি। কিসে ভাল থাকব তাই করেছেন।

*　　　　*　　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে বলতেন, "বুনো পাখী খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতো হয়ে যায় ; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।"

দুপুরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সকলে খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিশ্রাম করতেন, সেই সময় ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে গিয়ে দেখে আসতেন কোন লোকজন আছে কিনা। যদি দেখতেন কোন লোকজন নেই,

তখন মা সারদাকে বলতেন, "এই সময়ে যাও, কেউ নেই।"

মা বলছেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) ঘরের কাছে একটু দাঁড়াতেন, আমি খিড়কি ফটক দিয়ে রামলালের বাড়ির দিকে পাঁড়ে গিন্নীদের ওখানে বেড়াতে যেতুম। সমস্ত দিন কথাবার্তা কয়ে সন্ধ্যার পর যখন আরতি হত, আর সব লোক আরতি-টারতি দেখতে যেত, আমি সেই সময় (নহবতে) আসতুম।"

* * *

সেবার পানিহাটির বৈষ্ণব মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ যাবেন। সব ঠিকঠাক।

এমন সময় ঠাকুর জনৈক স্ত্রী ভক্তকে দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে, মা-ও যেতে ইচ্ছুক কিনা।

সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মা বলছেন, "উনি আমাকে যেভাবে যেতে বলে পাঠালেন, তাতেই বুঝতে পারলুম, উনি মন খুলে অনুমতি দিচ্ছেন না। তাহলে বলতেন, 'হাঁ, যাবে বৈকি! তা না করে উনি ওই বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর ফেলে বললেন 'ওর ইচ্ছা হয়তো চলুক'—তখন স্থির করলুম, যাবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভালো।"

একবার এক মাড়োয়ারি ভক্ত লছমীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দশ-হাজার টাকা প্রণামী দিতে চাইলেন। সে যুগে দশ হাজার মানে অনেক টাকা। ঠাকুরের ইচ্ছে নয় ওই টাকা গ্রহণ করেন। তবু তিনি মা সারদার মন পরীক্ষা করার জন্য এক পন্থা বার করলেন।

তিনি লছমীনারায়ণকে বললেন, মা ঠাকরুনের কাছে যাও—তিনি যদি এই টাকা গ্রহণ করেন।

লছমীনারায়ণ মা সারদার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা।

একথা শুনেই মা বললেন, "তা" কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলেও টাকা ঠাকুরেরই নেওয়া হবে। কারণ আমি রাখলে তাঁর সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না, ফলে ওটা তাঁরই নেওয়া হবে। তাঁকে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি

করে তাঁর ত্যাগের জন্যই ; কাজেই ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।”

এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, মা সারদা যখন হাসিমুখে ওই বিরাট অঙ্কের টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন, তখন কিন্তু তাঁরও টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। তবু লোভকে জয় করার এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন।

*　　　　*　　　　*

সন তারিখের সূত্র মিলিয়ে মা সারদার দক্ষিণেশ্বরে আসার মোট আট বারের বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও আগেই বলেছি, এই আট বারের বাইরেও মা আরও কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তেমন প্রমাণও সুস্পষ্ট।

মা ষষ্ঠ বার দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৮২ সালে। বাংলা ১২৮৮ সনের মাঘ ফাল্গুন মাসের কোন এক সময়।

এরপর আবার জয়রামবাটিতে ফিরে গিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন একটানা পিতৃগৃহেই বসবাস করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, মা সারদা সপ্তম বার দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৮৪ সালে। বাংলা ১২৯০ সনের মাঘ মাসে।

ওই সময়ে একদিন সমাধিমগ্ন অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ পড়ে গিয়ে আহত হন এবং বা হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয়। এতে তিনি খুবই যন্ত্রণা ভোগ করেন। খুবই কষ্ট পান।

মা সারদা প্রতিবারের মত এবারও দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকেই সোজা চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। হাতের পুঁটুলিটি মেঝেতে রেখে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মায়ের দিকে একবার তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, “কবে রওনা হয়েছ ?”

উত্তরে মায়ের কাছ থেকে ঠাকুর শুনলেন, তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় জয়রামবাটি থেকে যাত্রা শুরু করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলেই আমার হাত ভেঙ্গেছে। যাও যাও, যাত্রা বদলে

এসো গে।"

বিষণ্ণ মা সারদা আর কোন কথা না বাড়িয়ে সেই দিনই জয়রামবাটিতে ফিরে যেতে চাইলেন। এমন কথা শোনার পর তাঁর আর মুহূর্তও দক্ষিণেশ্বরে থাকার ইচ্ছে নেই।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না না, আজ থাক, কাল যেও।"

পরদিনই মা সারদা যাত্রা বদল বা নতুন করে যাত্রা শুরু করতে জয়রামবাটিতে ফিরে গেলেন।

* * *

এরপর ১৮৮৫ সালে (বাংলা ১২৯১) সালে মা সারদার ভাসুরপুত্র রামলালের বিবাহ উপলক্ষ্যে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। কামারপুকুর থেকে কয়েকদিনের জন্য জয়রামবাটিতেও গিয়েছিলেন।

কিন্তু সেবার বেশিদিন তিনি কামারপুকুর বা জয়রামবাটিতে থাকেন নি। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে (বাংলা ১২৯১ সালের ফাল্গুন) তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন।

এই তাঁর অষ্টমবার আগমন।

প্রামাণ্যসূত্রে গ্রথিত ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে, এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসান পর্যন্ত মা সারদা সম্ভবত আর দেশে যান নি।

এরপর তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুর, শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন।

সে এক ভিন্ন কাহিনী। সে এক দুশ্চর সাধনা।

* * *

কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, সে কথার সূত্র ধরে আবার বলতে চাই, এই আটবারের বাইরেও মা সারদা যে বারকয়েক দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে দেশে গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ বিভিন্ন ঘটনা অনুসরণেই পাওয়া যেতে পারে।

সেরকমই একটি বহুশ্রুত ঘটনা হচ্ছে তেলো-ভেলোর মাঠে নিঃসঙ্গ সারদার দস্যু-হৃদয় জয়ের কাহিনী। সেবারও তিনি কামারপুকুর থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলেন।

এই কাহিনী বলার আগে মায়ের অপার মাতৃত্বের স্বরূপটি একটু অনুধাবন করা প্রয়োজন। মা সারদা ৬৭ বছর এই জীবন-লীলায় প্রমূর্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন যেন মাতৃত্বের অত্যুজ্জ্বল আলোয় বিচ্ছুরিত। সেই ইতিবৃত্তের কিছু খণ্ডচিত্র এবার তুলে ধরব।

ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র বা পদ্মবিনোদের প্রতি মা সারদার অপার করুণার কথা আজ সর্বজনজ্ঞাত, যেমন সর্বজনজ্ঞাত সেই কাহিনীও। যেখানে মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে শুধু মাতৃ সম্বোধনে বদ্ধ হয়ে এক নষ্ট নারীর হাত দিয়ে অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ন পাঠাতেও দ্বিধা করেন নি।

এই যেমন একদিকের জীবন্ত ছবি, অন্যদিকে সেই চিরকালের অবহেলিত মানুষও মাতৃসন্নিধানে এসে ফিরে পেয়েছে নিজের অপহৃত সম্মান, ফিরে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস। এমনই কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

একদিন মা জয়রামবাটির অদূরে কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুলতলায় চৌকির উপর বসে আছেন, এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে নালিশ করল, তার উপপতি হঠাৎ তাকে ত্যাগ করেছে।

মেয়েটি এই উপপতির জন্যই ঘর সংসার সব ছেড়েছিল, এখন সে সম্পূর্ণ নিরুপায়।

মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে শ্রীশ্রীমা ওই ডোমকে ডেকে আনলেন। তারপর স্নেহপূর্ণ মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বললেন, "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে, এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে মহা অধর্ম হবে, নরকেও স্থান পাবে না।"

মায়ের কথায় লোকটির মন গলল এবং সে মেয়েটিকেও বাড়ী নিয়ে

গেল (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪০২)।

শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ জাতি-বর্ণ, দোষ-গুণ, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না। যে তাঁর কাছে এসে পড়ত, চাইত আশ্রয়, মা তার দোষ বা দুর্বলতা জানলেও তাকে অকাতরে স্নেহ করতেন, আশ্রয় দিতেন, সাহায্য করতেন, শোকে-দুঃখে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখাতেন এবং অপরকে ওরকম করতে শেখাতেন।

তার সে অকৃত্রিম মাতৃত্বের প্রভাবে দুশ্চরিত্র লোকেরও স্বভাব পরিবর্তিত হত, দস্যুও ভক্তে পরিণত হত।

জয়রামবাটির কাছেই শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তারা একসময় তুঁতের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুঁতে চাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই তুঁতে চাষী নিরুপায় মুসলমানরাই চুরি ডাকাতি আরম্ভ করে।

শেষ পর্যন্ত জননী সারদামণির উদার ভাব এবং অপার করুণায় সেই কুখ্যাত "তুঁতে ডাকাতদের" জীবনেও দেখা দেয় পরিবর্তন। গ্রামের মানুষ অবাক বিস্ময়ে বলে "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল" (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪০২)।

এই যে সামাজিক রূপান্তর—একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমিত হলেও আকস্মিক ভাবে সংঘটিত হয়নি। কিংবা এই মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি কোন মন্ত্রবলেও। এর পিছনে ছিল জননীর অপার উদার ভাব, যা মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটাতে প্রস্তুত করেছে ক্ষেত্রভূমি।

বিষয়টিকে বোঝার জন্য একটি ঘটনার (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪০৩) উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা এনে বলল : "মা ঠাকুরের জন্যে এগুলি এনেছি, নিবেন কি ?"

মা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন "খুব নেব, বাবা দাও। ঠাকুরের জন্যে এনেছ, নেব বইকি।"

মায়ের অনেক স্ত্রীভক্ত সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন : "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন ?"

মা সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে কলাগুলি তুলে রাখলেন এবং মুসলমানকে মুড়ি-মিষ্টি দিতে বললেন।

সে চলে গেলে মা সেই ভক্তটিকে তিরস্কার করে গম্ভীরভাবে বললেন, "কে ভাল, কে মন্দ আমি জানি।"

তিনি মন্দকে উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, "দোষতো মানুষের লেগেই আছে, কি করে যে তাকে ভালো করতে হবে, তা জানে ক'জনে?"

মা জানতেন বলেই আজ তিনি বিশ্বজননী।

তাই—"সাতবেড়ের লালু জেলের" গান শোনানোর আব্দার অতি সহজেই প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেন তিনি। আবার জয়রামবাটির চৌকিদার অম্বিকাকেও নিজের দাদার আসনে গ্রহণ করতে পারেন একান্ত আপনজন হিসেবে। "জীবই শিব" এই তত্ত্ব ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে তিনি নিজের জীবনে সপ্রমাণ করেছিলেন।

আর সেই জন্যই চিরকালের অবহেলিত মানুষের সুপ্ত ও ম্রিয়মান হৃদয়ে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন দেবত্বের সম্ভাবনা।

তাই দেখি প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যেও শিহড়গ্রামের সেই পাগলটা সাঁতার কেটে ভয়াবহ নদী পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে মায়ের জন্য এক-বোঝা সজনে শাক নিয়ে এসে জয়রামবাটিতে উপস্থিত হয়।

আরেকজন ভক্ত—জাতে যুগী, তাই তার চলাফেরায় বড়ই সঙ্কোচ। এটা মায়ের চোখেও পড়েছে।

একদিন তিনি ওই যুগী ভক্তকে ডেকে বললেন, "তুমি যুগী বলে সঙ্কোচ করছ-তাতে কি বাবা? তুমি যে ঠাকুরের সন্তান—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছে।" এখানেই শেষ নয়, সেই কুণ্ঠিত ভক্তের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলার জন্য বললেন, দীক্ষাদান কালে তিনি তো কি জাতি এ প্রশ্ন করেন নি। জাত বিচার করেন নি। এ থেকেই বুঝে নেওয়া উচিত, তিনিও মায়েরই ঘরের ছেলে (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩৮৯-৯০)।

এরকম কত ঘটনা।

সেবার মহাষ্টমীর দিন ভক্তরা সবাই শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিচ্ছেন। মায়ের নজরে পড়ল, শুধু একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে।

মা তাঁকে ডাকলেন, তার কাছ থেকে জানলেন, বাড়ি তাঁর তাজপুরে, জাতিতে তিনি বাগ্দী। তাই, ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

যিনি দুর্বলের বুকে সাহস সঞ্চার করতেই এসেছিলেন। যিনি বেদনা-জর্জর বুকের পাঁজরে বজ্রের শক্তি সঞ্চার করতেই মানবী বেশে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি তো জাতপাতের সংকীর্ণতাকে ভেঙ্গে চুরমার করার ব্রত পালন করেই আজ বিশ্বজননী।

মা ডাকলেন সেই বাগ্দীকে, বললেন, "ভিতরে এস"। স্খলিত চরণে তিনি ঘরে ঢুকলেন, তাঁর প্রাণের আর্তি পূর্ণ হল। মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে তিনি প্রণাম করলেন (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩৮৯-৯০)।

করুণাময়ী জননীর অপরূপ জীবন-কথার পাতায় পাতায় দুঃখীজনের নিত্য আনাগোনা।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চারদিকে নানা সংকটের কালো ছায়া, প্রচণ্ড সংকট জামা-কাপড়েরও। এই সংকটের করাল গ্রাস থেকে জয়রাম-বাটির মত নিভৃত পল্লীজীবনও মুক্ত নয়।

সেদিন সকাল দশটার সময় দেশড়ি গ্রামের বৃদ্ধ হরিদাস বৈরাগী এলেন মায়ের কাছে। হরিদাসের গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। এমন কি গিরিশচন্দ্রের মত একজন খ্যাতনামা মানুষও এই বৈরাগীর গুণগ্রাহী। হরিদাসকে মা তেল দিলেন, বললেন, যাও স্নান করে এস। স্নানান্তে করলেন প্রসাদের ব্যবস্থা।

কথায় কথায় সেই জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ মায়ের কাছে নিবেদন করলেন: তাঁর পরিধেয় বস্ত্র নেই।

শ্রীমা সকালে স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি উঠানে শুকোতে দিয়ে-ছিলেন। কাপড়টি একেবারেই নতুন—মাত্র দু'একদিন মা পরেছেন। বৃদ্ধের বস্ত্রাভাবের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাপড়টি উঠোন থেকে তুলে এনে তাঁকে দিলেন।

হরিদাস এই অপ্রত্যাশিত মাতৃ-স্নেহে বিহ্বল হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে

সেই স্নেহের দান মাথায় ঠেকিয়ে বিদায় নিলেন (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৪৩৭)।

বাগবাজারে "উদ্বোধন" কার্য্যালয়—যেটা কিনা এখন "মায়ের বাড়ি" বলেই সর্বজনে পরিচিত—সেই উদ্বোধনের সাধারণ একজন কর্মচারী ৺চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের করুণা ধারায় অবগাহন করে আজও ভক্তজনের স্মৃতিতে অক্ষয় জীবনের অধিকারী।

নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় কলকাতায় এসেছিলেন তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে। পূর্ববঙ্গে নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন সবাই ছিল—যাদের ভরণপোষণের জন্যই তিনি কলকাতা শহরে সেদিন অনশনে অর্দ্ধাশনে পথে পথে ঘুরছিলেন। কিন্তু তার ভাগ্য ছিল ভালো, জীবন হয়েছিল ধন্য।

তিনি মায়ের বাড়িতে একটা কাজ পেয়ে গেলেন। এমনই ভাগ্যবান ছিলেন তিনি যে, মায়ের ফাই-ফরমাস যেমন খাটেন, তেমনি পান জননী সারদার স্নেহাদর।

হঠাৎ একদিন খবর এল কীর্তিনাশা পদ্মা চন্দ্রবাবুর বাড়ি ঘর সব গ্রাস করেছে। তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—মাথা গোঁজারও স্থান নেই।

এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে চন্দ্রবাবু দিশেহারা হয়ে পড়লেন—কী করবেন, কোথায় যাবেন, কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। পাগল হওয়ার যোগাড়। আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন।

খবরটা এক সময় জননী সারদার কানেও পৌছল। মা প্রিয় সন্তান চন্দ্রের বিপদের কথা জেনে বিষম ব্যথিতা হলেন এবং একান্ত গোপনে চন্দ্রকে তিনশ' টাকা দিয়ে বললেন: "দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এসো।"

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সে সময় তিনশ' টাকার অর্থমূল্য বহুগুণ বেশী ছিল।

এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বামী সারদেশানন্দ (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬-২৭) বলেছেন: মায়ের সেই অহেতুক কৃপার কথা ভক্তি

বিগলিত চিত্তে বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রদা বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। এরকম কত বিচিত্র ঘটনা যে উদ্বোধনে ঘটত, তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন স্বভাবের বহু সন্তানকে স্নেহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করে স্বল্পপরিসর উদ্বোধনের বাড়ীতে যে অদ্ভুত সমাবেশ মা সৃষ্টি করেছিলেন, তা দেখে মনে হয় "সর্বস্য হৃদি সংস্থিতে মহামায়া।"

তিনিই আবার লিখছেন: উদ্বোধনের ঝি চাকর বামুন সকলেই মায়ের সন্তান—মায়ের স্নেহের সম অধিকারী, তাদেরও সকলের জন্য মায়ের সমান ভাবনা।

কার জন্য ভাবেন নি মা?

যার জন্য কেউ ভাবে না, কেউ ভাবেনি—সেই অসহায়া অনাথের জন্যও মাতৃবক্ষের পাঁজর ভেদ করে উঠেছে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়"—আজ যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, সেই আন্দোলনের মূল ভাবটিও মা তাঁর নিজের জীবনেই প্রমূর্ত্ত করে দিয়েছেন। নিজে দুঃখের অনলে জ্বলেছেন, সেই সঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছেন অন্য জীবনে প্রাণের প্রদীপ। যেমন সেদিন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনে।

স্বামী ঈশানানন্দজী সেদিনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন (মাতৃ-সান্নিধ্যে): সকালে কিছু আনাজপাতি, পূজার ফুল ইত্যাদি নিয়ে বেলা ন'টা নাগাদ কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটি পৌঁছে শুনলাম, মা বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ীতে গেছেন। সময়টা হচ্ছে ১৩২৪ সনের (ইং-১৯১৭) শ্রাবণ মাস।

কিছুক্ষণ পরে মা সেখান থেকে ফিরে এসে বললেন, বাঁড়ুজ্যেদের একটি অনাথা বিধবার (৺রাজেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) কানের মধ্যে ঘা হয়েছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। অথচ ভদ্রমহিলার থাকার মধ্যে আছে কেবল একটি নাবালক ছেলে। কে চিকিৎসা করবে, দেখবেই বা কে? সময়মত চিকিৎসা না হওয়ায় কানের ভিতর ঘা পচে গিয়ে বড় বড় পোকা হয়েছে, দুর্গন্ধে কেউ কাছেও যেতে পারে না।

ওই সহায়হীনা বিধবার জন্য আর কেউ না থাকলেও মা সারদা

আছেন।

তাই তিনি সকালে নিম পাতার জল গরম করে নিয়ে একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করে গিয়েছিলেন। নিজের হাতে ঐ জল পিচকারি দিয়ে ঘা পরিষ্কার করে ফিরে এলেন।

স্বামী ঈশানানন্দ বলছেন: বেলা অনেক হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে ঠাকুরপুজো সেরে আমাকে প্রসাদ ও জল দিলেন এবং স্ত্রীলোকটির অবস্থার কথা সব জানিয়ে বললেন, আচ্ছা, তোমরা কোয়ালপাড়া আশ্রমে মাঝে মাঝে অসহায় রোগীদের রেখে সকলে সেবা-শুশ্রূষা কর। আহা, কেদারকে বলে তোমরা যদি বাঁড়ুজ্যেদের বিধবা বৌটিকে নিয়ে গিয়ে সেবা কর তো বড় উপকার হয়। দেখবার কেউ নেই। যত্নের অভাবে ঘায়ের দুর্গন্ধে কাছে কেউ যায় না। নাবালক ছেলেটিরও কি কষ্ট, বাবা!

মায়ের ঐ বুকভরা যন্ত্রণা যেন স্বামী ঈশানানন্দের প্রাণে গিয়েও আঘাত করল।

তিনি আর দেরী না করে তখনই কোয়ালপাড়া চলে গেলেন। তারপর কেদার মহারাজের কাছে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে কেদার মহারাজ বললেন পালকি ঠিক করতে। কিন্তু পালকি না পাওয়ায় একটা গরুর গাড়ি ঠিক করা হল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওই গরুর গাড়ি নিয়ে স্বামী ঈশানানন্দ জয়রামবাটি রওনা হলেন।

পথ যদিও বেশী নয়, কিন্তু সে যুগে সেই সংক্ষিপ্ত পথও ছিল দুর্গম। নদী পার হয়ে শিরোমণিপুর শিহড় ঘুরে যখন তিনি জয়রামবাটি পৌছুলেন, তখন সকাল হয়ে গেছে।

তাঁদের দেখে মা সারদা খুব খুশী হলেন। বললেন, তোমরা বেশ করে মুড়ি খেয়ে বউটিকে নিয়ে রওনা হও। তা না হলে কোয়ালপাড়া পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে।

সে যুগে তো গ্রামাঞ্চলে স্ট্রেচার ছিল না। তাই একটা তক্তা যোগাড় করে তাতে রোগীকে শুইয়ে এনে গরুর গাড়িতে তোলা হল।

মা সারদা একটু গরম দুধ নিয়ে এলেন। রোগিণীকে খাওয়ালেন—

তারপর সেই শাশ্বত জননীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল আশ্বাসবাণী, সান্ত্বনার কথা। অবশেষে জানালেন বিদায়।

শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা—জল কাদায় একেবারে ভয়াবহ। সেই সাত-আট মাইল রাস্তা পার হয়ে কোয়ালপাড়া আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সেখানে পৌঁছেই গ্রামের এক ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তিনি এসে সম্ভবমত ওষুধ দিয়ে ঘা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মাথার ভিতর পর্যন্ত ঘা, নাক-মুখ দিয়েও বড় বড় পোকা কিলবিল করে বেরিয়ে আসছিল, দুই কান দিয়েই পুঁজ-রক্ত পড়ছে—খুবই দুর্গন্ধ।

এও যেন সেবাধর্মে দীক্ষিত সেই নবীন সন্ন্যাসীদের এক পরীক্ষাক্ষেত্র, ভাবীকালের সেবাব্রত পালনের পটভূমিকা।

কোয়ালপাড়া আশ্রমের সন্ন্যাসী কর্মীরা দিন রাত এই নতুন পূজা-অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করলেন। আর্ত-পীড়িতের মধ্যেই শুরু হল ঈশ্বর সাধনা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টাই বিফল হল। সেই অনাথা রমণী যন্ত্রণার সমুদ্র পেরিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন।

এবার সৎকার ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

তাই বাঁড়ুজ্যেদের খবর দেওয়ার জন্য জয়রামবাটি গেলে মা সারদা অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুনলেন সেই অভাগিনীর শেষ যন্ত্রণার কাহিনী। তারপর বললেন, 'আহা, তোমরাই তার ছেলের কাজ করলে বাবা। এখানে থাকলে মুখে একটু জলের অভাবেই মারা যেত।'

দুঃখী জনের বেদনায় জননী সারদামণি যে কিভাবে জর্জরিতা হতেন—তা বোঝার জন্য আমরা স্বামী ঈশানানন্দ কথিত আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি (মাতৃসান্নিধ্যে, পৃঃ ৫৩)।

সেটা ইংরাজি ১৯১৮ সালের ঘটনা। শীতকাল। সেদিন স্বামী সারদানন্দ পুরী থেকে জয়রামবাটিতে মাকে একটি পত্র দিয়েছেন—মা সেই পত্রটি শ্যামবাজারের প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়কে পড়তে দিলেন। পত্রটি বড়—তিন চার পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সে সময় ওড়িশায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র খুলে ক্ষুধার্তের অন্নদান সেবার ব্রত পালন করছিল।

স্বামী সারদানন্দজী ওই পত্রে ওড়িশার দুর্ভিক্ষে মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রাণস্পর্শী বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি মিশন সীমিত সাধ্য নিয়ে কিভাবে সেবাব্রত পালন করছে, তারও বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যাতে মানুষের অসহনীয় দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

তিনি ওই পত্রে আরও লিখেছেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের ব্যাপক অভাবের তুলনায় মিশনের সাহায্য অতি সামান্য—কি ভাবে এর প্রতিবিধান হবে, সেটাই একটা সমস্যা।

স্বামী ঈশানানন্দের লেখা অনুসরণে দেখি, মা ওই চিঠি পড়া শুনছেন আর অবিরাম চোখের জল ফেলছেন : 'ঠাকুর, লোকের দুঃখ কষ্ট আর দেখতে শুনতে পারিনে। তাদের দুঃখ-জ্বালার অবসান কর।'

তারপরই প্রবোধ বাবুকে বলছেন, "প্রবোধ, শরতের দিল দেখলে? যেন বাসুকী—যেখানে জল পড়ে শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে। শরতের মতো অমন দিলদরিয়া লোক, জীবের দুঃখে এত প্রাণ কাঁদা-সকলকে পালন করছে, অন্নদান করছে, যেন পালন কর্তা! ঠাকুর রাশ ঠেলে দাও, সকলকে দেবার জন্য তার দু'হাত ভরে দাও।"

জীবের দুঃখে আত্মহারা, দুঃখী জনের আর্তনাদে দিশেহারা মা সারদা আপনমনে এই কথা বলছেন, আর চোখের জল দু'হাত দিয়ে মুছছেন।

এই হল দুঃখীজনের মা। জগতের মা। সবাকার মা।

সেই মা সারদাই সেদিন একজন অতিসাধারণ গ্রাম্য রমণীর বেশে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে চলেছেন।

সেবার গঙ্গাস্নানের এক পুণ্যযোগ পড়েছিল। কামারপুকুরের অনেকেই তাই গঙ্গাস্নান করতে কলকাতা যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন।

মা সারদাও তাঁদের সঙ্গী হলেন। সঙ্গে নিলেন লক্ষ্মীদিদি এবং শিবরাম দাদাকেও। তিনি অবশ্য শুধু গঙ্গাস্নান করতেই যেতে চাননি। অন্যরা ফিরে এলেও তিনি কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে থেকে যাবেন—এই ছিল তাঁর বাসনা।

কামারপুকুর থেকে পাঁয়ে হেঁটে প্রায় আট মাইল দূরে আরামবাগে যখন তাঁরা এলেন, তখনও সন্ধ্যা হতে অনেক বাকি। প্রথমে তাঁরা ঠিক করেছিলেন, রাতটা আরামবাগে কাটিয়ে পরদিন সকালে তেলোভেলোর মাঠ পার হবেন। কিন্তু সন্ধ্যা হতে দেরি আছে দেখে, সকলে ঠিক করলেন, পা চালিয়ে পেরিয়ে যেতে পারলে, রাত হওয়ার আগেই তেলোভেলোর মাঠ পার হয়ে যেতে পারবেন।

তাই, তাঁরা আর বিশ্রাম না করে দিনের আলো থাকতে এগিয়ে চললেন সেই ভয়াবহ মাঠের দিকে।

মাঠ নয়—প্রান্তর। ভয়ঙ্কর প্রান্তর।

তারকেশ্বর থেকে আরামবাগের দিকে যাওয়ার পথেই পড়ে মুথাডাঙ্গা। সেই মুথাডাঙ্গা থেকে ডান হাতি রাস্তাটা গিয়ে মিশে গেছে তেলোভেলোর প্রান্তরে। এখন সেখানে মা সারদার মন্দির তৈরি হয়েছে।

আর আছে সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতকালীর মন্দির।

তেলিয়া আর ভেলিয়া—এই দু'টো গ্রাম। সংক্ষেপে তেলোভেলো। দুই গ্রামের মধ্যবর্তী বিশাল প্রান্তর—এখনও রাতের অন্ধকারে সেখানে পা বাড়ালে গা ছমছম করে।

আর সেদিন? সেদিন এই প্রান্তর ছিল ডাকাতদের অবাধ রাজত্ব। ডাকাতকালীর পুজো করে এই ডাকাতরা শিকারী নেকড়ের মতই ওঁৎ পেতে পথিকের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। আক্রমণ করত। সর্বস্ব লুঠ করত। প্রাণও হরণ করত।

তাই তেলোভেলোর নামে মানুষের এত ভয়। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ওই মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বরে শিবের আশ্রয়ে পৌঁছে যাওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করতেন।

সেদিনও সবাই সেই চেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু মা সারদা যে বেশি জোরে হাঁটতে পারতেন না। তার ওপর শরীর দুর্বল। ক্লান্ত দেহ।

তাই বলে তাঁর জন্য অন্য কারোর অসুবিধা হবে, সেটাও তিনি চাইতেন না। যদিও তিনি বুঝেছিলেন, এতটা পথ এত দ্রুত তিনি হাঁটতে পারবেন না, তবু তিনি নীরবে সকলের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন।

কিছুদূর গিয়েই তিনি আর হাঁটতে পারছিলেন না। পায়ে পায়ে অন্য সকলে এগিয়ে চললেও ধীরে ধীরে তিনি পিছিয়ে পডতে থাকেন। চলার গতি কমে আসতে থাকে, দেহের দুর্গতি বাড়তে থাকে।

সঙ্গীদের আর তর সয় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাঁদের মনেও প্রসারিত হচ্ছে আতঙ্কের কালোছায়া। তবু তাঁরা দু'একবার মা সারদার জন্য অপেক্ষা করলেন।

কিন্তু ভীত-ত্রস্ত তাঁদের পক্ষেও এভাবে বার বার অপেক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ডাকাতের ভয়, প্রাণের ভয় তখন সকলের মধ্যে প্রবল। তাঁরা মনে মনে বুঝলেন, এভাবে ধীরগতিতে হাঁটতে থাকলে সন্ধ্যার আগে তেলোভেলোর মাঠ পার হওয়া যাবে না।

মা সারদাও বুঝলেন, তাঁর জন্য সঙ্গীরা বিব্রতবোধ করছেন। তিনি তখন নিজেই সকলকে বললেন, "আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে

না। আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। আমি ঠিক চলে যাব।”

মা সারদার এই আশ্বাসবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীরা আর বিন্দুমাত্র কালহরণ না করে দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিলেন। তাঁরা ছুটে চললেন তারকেশ্বরের দিকে।

আর মা? একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই একান্ত নির্জন প্রান্তরে মনের জোরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন।

তিনি এগিয়ে চললেন। রাতও এগিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিমের আকাশে আবীর ছড়িয়ে দিয়ে দিনান্তের সূর্য তালগাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। তরল অন্ধকার যেন ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিশাল প্রান্তরের বুকে।

তবু মা সারদা বুকে সাহস সঞ্চয় করেন। বিপদে অবিচল থাকেন।

কিন্তু এই দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে তিনি কোথায় যাবেন? কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাবেন? সঙ্গীরাতো চলে গেছেন। বহু দূরে। মা সারদা ভাবতে থাকেন।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, কোথাও কোন জনবসতির চিহ্ন নেই। আকাশে তারা ফুটতে থাকে, মাটিতে কোন আলোর চিহ্ন নেই।

অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে ওঠে।

তবু মা অসীম সাহসে ভর করে এগিয়ে চলতে থাকেন—থামার যে উপায় নেই। অজানা অচেনা এই প্রান্তরে কোথায় থামবেন তিনি?

হঠাৎ সেই অন্ধকারের বুকে ভেসে উঠল এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাবয়ব মূর্তি। অন্ধকারের তুলনায় তার গায়ের রং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ বলেই অতি সহজে সেই মূর্তি নজরে পড়ল।

মা সারদা চমকে উঠলেন, এ আবার কে?

মা দেখলেন, সেই সচল মূর্তি তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। একটু কাছে আসতেই মা দেখলেন, বিশাল সেই পাথর-প্রতিম কৃষ্ণমূর্তির কাঁধে লম্বা লাঠি, পেশীবহুল দুই হাতে রূপোর বালা, ঘনচুল কুঞ্চিত। শ্বেতপাথরের মত ঝকঝকে দাঁত।

—তাহলে কি এই সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত? মা সারদার মনে আতঙ্ক এসে ভিড় করে। কিন্তু এই বিপদে অন্য কোন উপায় যখন নেই, তখন ভয়কে জয় করার জন্যই মা নিজেকে সংযত করলেন।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি কিছুক্ষণ যেন মা সারদার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মায়ের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যই যেন হুঙ্কার ছাড়ল: "কে গো, এ সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কোথায় যাবে?"

"পূবে"। সাহসে ভর করে মা জবাব দিলেন।

সেতো এ পথ নয়, ওই পথে যেতে হবে। লোকটি কর্কশ কণ্ঠে বলল।

মা তখন শঙ্কিত-হৃদয় এক অচল মাতৃপ্রতিমা। কী করবেন, কোথায় যাবেন, কী বলবেন—কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

ইতিমধ্যে সেই লোকটি একবারে মায়ের কাছাকাছি এসে গেছে।

খুব কাছে এসে সেই লোকটি মায়ের পবিত্র মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেল। নরঘাতকের মনে আকস্মিক কোন কারণে দেখা দিল রূপান্তর। সে অভিভূত স্বরে মাকে বলল, "ভয় নেই, আমার সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে, সে পিছিয়ে পড়েছে।"

ভীতা সারদা তখন সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে দেখলেন, সেই অন্ধকারের বুক চিরে একজন স্ত্রীলোক তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। সামনে যদিও ভয়ঙ্কর বিপদ, তবু পিছনে দেখা গেল আশ্বাসের ক্ষীণ আলো।

এবার মা যেন আশ্বস্ত হলেন।

তিনি একটু দম নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর মানুষটিকে সম্বোধন করে বললেন: "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাঁদের কাছে পৌঁছে দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে তিনি তোমাদের খুব আদর যত্ন করবেন।"

মা সারদার কথা শেষ হওয়ার আগেই সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল।

মা সারদা দু'পা এগিয়ে গেলেন সেই স্ত্রীলোকটির দিকে। তারপর পরম বিশ্বাস ও স্নেহভরে তার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম, ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নাহলে কি করতুম বলতে পারিনে।"

মা সারদার ওই সরল ও অকপট ব্যবহারে ডাকাতদম্পতিরও মনে দেখা দিল ব্যাপক পরিবর্তন। তারা মুহূর্তের মধ্যেই মা সারদার একান্ত আপনজনে পরিণত হল। তারা ভুলে গেল সামাজিক বিধিনিষেধ, ভুলে গেল জাতিগত বিভেদের কথা। মা সারদাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই তারা স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে গ্রহণ করল।

ডাকাত মা বাবাই তখন সারদার নির্ভয় আশ্রয়।

* * *

কিন্তু ঘটনাটা কি ঘটেছিল?

এরকম একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, ওই ডাকাত যখন সেই অন্ধকারে নির্জন প্রান্তরে নিঃসঙ্গ মায়ের দিকে হাত বাড়ায়, তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত দেখতে পেল, এ কোন সাধারণ রমণী নয়, ইনি সেই মা কালী, যিনি কিনা এই ডাকাতেরও আরাধ্যা। মা সারদার মধ্যেই সেদিন সেই ডাকাত দেখেছিল স্বয়ং মা কালীকে।

তাই, এক লহমায় তার মধ্যে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। সে মা সারদাকে আপন জননীরূপে গ্রহণ করেছিল এবং বুঝেছিল, ইনি কোন সাধারণ রমনী নয়।

* * *

অবশ্য এই কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হলেও মা সারদা এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে রাজি হলেন না।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে অনুসরণ করে (শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮২) জানতে পারি ঃ—

নরঘাতক এবং দস্যুবৃত্তিপরায়ণ ডাকাত দম্পতির কঠোর মন হয়তো শ্রীমায়ের অনন্যসাধারণ সরলতা এবং অশ্রুতপূর্ব পবিত্রতাই জয় করেছিল। অথবা, হয়ত বা এর পেছনে কোন দৈবীশক্তিও ছিল। এই দ্বিতীয় কল্পনা একবারে ভিত্তিহীন নয়।

কারণ শ্রীমা কথাচ্ছলে কোন কোন ভক্তকে যা বলেছেন, তা থেকে এই আভাষ পাওয়া যায়।

ভক্তরা মা সারদার মুখেই শুনেছিলেন, তিনি একবার বাগ্‌দী দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো ?"

তারা উত্তর দিয়েছিল, "তুমি সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখেছি।"

মা সারদা বাধা দিয়ে বললেন, "সে কি গো, তোমরা এটা কি দেখলে ?"

তারা সেই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বাসপূর্ণ অনুযোগসহকারে বলল, "না মা, আমরা সত্যি দেখেছি। আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করেছ।"

মা সারদা উদাসীনভাবে বললেন, "কি জানি আমি তো কিছুই জানি না।"

* * *

সে যাই হোক, পরবর্তী ঘটনায় আমরা দেখি, ডাকাত দম্পতি সেই রাত্রে মা সারদাকে আর পথ চলতে না দিয়ে কাছের গ্রামে এক দোকানে নিয়ে গেল।

সেখানেই রাত্রিবাস।

ডাকাত-গিন্নি নিজের কাপড় বিছিয়ে মা সারদার জন্য বিছানা করে দিল। সেই বিকট-দর্শন ডাকাত দোকান থেকে কিনে নিয়ে এল মুড়ি মুড়কি। মা সারদা যেন নিজের পিতা-মাতার নির্ভয় আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আর সেই বাগ্দী-ডাকাত সারারাত লাঠি হাতে নিয়ে দ্বাররক্ষায়

নিযুক্ত রইল।

তারপর একসময় পূর্ব দিগন্তে আগুনের আভা ছড়িয়ে দিয়ে ভোর হল।

ডাকাত-দম্পতি তাদের এই পথে পাওয়া মেয়েকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল তারকেশ্বরের দিকে।

পথে ডাকাত-গিন্নি ক্ষেত থেকে কোচর ভরে কড়াইশুঁটি তুলে নিয়ে এল। তারপর মা সারদাকে দিল তা—সকালের জলখাবার। মা-ও বালিকার মতই হাসিমুখে সেই কড়াইশুঁটি খেতে খেতে পথ চলতে শুরু করলেন।

তারকেশ্বরে যখন তাঁরা পৌঁছলেন, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। তাঁরা গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক চটিতে। ডাকাত-গিন্নি নিজের স্বামীকে বললেন, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি, বাবা তারকনাথের পূজা শিগগির সেরে বাজার থেকে মাছ তরকারি নিয়ে এস, আজ তাকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।

* * *

লক্ষ্য করার বিষয়, এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা এবং গৃহবধূ হয়েও মা সারদা কত সহজে এক বাগ্দী-দম্পতির সঙ্গে এক রাত্রির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুললেন। এক ভয়ঙ্কর ডাকাতের হৃদয় জয় করলেন। জাত-গোত্রের প্রাচীর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, লোকনিন্দার সম্ভাবনাকে স্বেচ্ছায় মা অগ্রাহ্য করলেন।

তাই, কিছুক্ষণ পরে তাঁকে সেই নির্জন প্রান্তরে ফেলে দিয়ে যাঁরা চলে এসেছিলেন, তাঁরা যখন আবার খুঁজতে খুঁজতে মা সারদার কাছে এলেন, তখন সবকিছু ভুলে তিনি সবাইকে আবার নিজের করে নিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ অকপটে তিনি পথে পাওয়া বাগ্দী-মায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন : "এরা এসে আমাকে রক্ষা না করলে কাল রাত্রে যে কি করতুম, বলতে পারি না।"

তারপর সকলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে কৈকালার মাঠ

পেরিয়ে বৈদ্যবাটির দিকে রওয়ানা হলেন।

ডাকাত-দম্পতিও বেশ কিছুটা পথ তাঁদের সঙ্গেসঙ্গেই এলেন। অবশেষে সেই পাষাণ-হৃদয় ডাকাতের চোখেও জলের রেখা চিক্‌চিক্ করে উঠল। ডাকাত-গিন্নি পারল না নিজেকে সংযত রাখতে। এবার যে তারা ফিরে যাবে।

মা সারদার চোখেও জল।

ডাকাত-গিন্নি পথের পাশে ক্ষেত থেকে অনেকগুলি কড়াইশুঁটি তুলে এনে সারদাকে দিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলল : "মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস।"

মা সারদা তাদের দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। উত্তরে ডাকাত-গিন্নি বলল, "মা, নিশ্চয়ই যাব।"

তারা কথা রেখেছিল। অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে তারা একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের কথা সবই শুনেছিলেন। তাই, ঠিক জামাইয়ের মতই তিনি ওই ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে আচরণ করেন। খুব আদর যত্ন করেন.

একবারই নয়, কয়েকবারই তারা মেয়ে সারদাকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল।

যিনি "সতের মা অসতেরও মা," "যিনি ভালোর মা মন্দেরও মা" —তিনি যে স্বীয় চরিত্রমাধুর্যে ওই কঠিন-হৃদয় ডাকাতের অন্তর জয় করে নেবেন, তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

* * *

তাইতো "মা" বলে কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর কাছে অতি সহজেই ধরা দিতেন—ভাল মন্দ বিচার করতেন না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের খাবারের থালা হাতে ঠাকুরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় এক মহিলা এসে বলল, "দিন মা, থালাটা আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

মা অতি সহজেই ঠাকুরের ভোজ্যপূর্ণ সেই থালাটা ওই মহিলার

হাতে তুলে দিলেন। মহিলাও থালাটা নিয়ে সটান চলে গেলেন ঠাকুরের ঘরে। তারপর ঠাকুরের সামনে থালাটা সাজিয়ে দিয়ে এক লহমায় চলে এলেন।

একটু পরেই মা এসে সে ঘরে ঢুকে দেখেন ঠাকুর অন্ন গ্রহণ করেননি। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

মা বিস্মিত হলেন। হল কি ?

ঠাকুর মায়ের দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন "তুমি এ কি করলে ? ওর হাতে দিলে কেন ? ওকে কি জান না ? ও অমুকের ভাজ, দেওরকে নিয়ে থাকে। এখন ওর ছোঁয়া অন্ন আমি খাই কি করে ?"

শান্তকণ্ঠে মা বললেন, "তা জানি। আজ খাও।"

তবু ঠাকুর সহজ হতে পারলেন না। অন্নও স্পর্শ করলেন না।

মা মিনতি করে বললেন, "বসে থেকো না খাও।"

ঠাকুরের কণ্ঠে দৃঢ়তা, "আর কোনদিন কারও হাতে দেবে না বলো।"

জোড়হাত করে মা বললেন, "তা তো আমি পারব না ঠাকুর। তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব, কিন্তু আমায় মা বলে কেউ চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমিতো শুধু আমার ঠাকুর নও, তুমি সকলের।"

মা সারদার এই উদার বাণীর কান্ত পূতাগ্নি স্পর্শে নিমেষে ওই স্পর্শদুষ্ট অন্নই শুদ্ধান্ন হয়ে গেল।

ঠাকুরও প্রসন্ন হয়েই ওই অন্ন গ্রহণ করলেন।

সারদা-জননী শ্যামসুন্দরীর আক্ষেপ ছিল, এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বিয়ে দিলুম, আহা ! ঘরসংসারও করলে না, ছেলে-

পিলেও হল না, মা বলাও শুনল না।'

অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছিলেন সেই আক্ষেপের হাহাকার।

তাই একদিন শ্যামসুন্দরীকে বললেন তিনি, "শাশুড়ী ঠাকরুন, সেজন্য দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"

এখানেই শেষ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সরাসরি মা সারদাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কি ছেলেপিলের ইচ্ছে আছে না-কি মনেতে?"

আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, মা উত্তর দিলেন, "না, আমি কিছুই চাই না, চাই কেবল তোমার আনন্দ।"

অন্য একদিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) কথা বলছিলেন মা সারদাকে, বলছিলেন, এমন চোখ তোমায় দেখাবো যেমনটি আর কখনো দেখনি। নরেন একেবারে মূর্তিমান জ্ঞান, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে। কী তার চোখ দু'টি, তুমি দেখো।

কি করে তাকে দেখব? বিস্মিত মা প্রশ্ন করলেন, বললেন, আমি তো ছেলেদের সামনে বেরোই না।

আচ্ছা সে হবে'খন। তখনকার মত এই উত্তর দিয়ে ঠাকুর প্রসঙ্গের ইতি করলেন।

এরপর একদিন ঠাকুর নিজেই নরেন্দ্রনাথকে নহবত ঘরে পাঠালেন কী একটা জিনিস আনতে। নরেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মায়ের কাছে ওই জিনিসটি চাইলেন।

বাইরে থেকেতো মা সারদাকে দেখা যেত না। নহবত ঘরের চারদিকে ছিল দরমার বেড়া। সেই বেড়ার ফাঁক দিয়েই মা নরেন্দ্রনাথকে দেখলেন—কী চমৎকার চোখ, কেমন স্বচ্ছ, যেন আয়না। দেখলে চোখ জুড়োয়।

* * *

ওই বেড়ার আড়ালেই মা নিজেকে গোপন করে রাখতেন।

বাইরের লোক দূরের কথা, মন্দিরের কর্মচারীরাও মায়ের দেখা পেতেন না।

একবার জনৈক ভদ্রলোক মন্দিরের খাজাঞ্চিকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আচ্ছা, পরমহংসদেবের পত্নী কোথায় থাকেন ?

উত্তরে খাজাঞ্চি বলেছিলেন, শুনেছি মন্দিরেই থাকেন, কিন্তু কোনো দিন চোখে দেখিনি।

অবগুণ্ঠনবতী মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন লোকলোচনের বাইরে। সে এক কঠিন তপস্যা। অনেক সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনও পেতেন না।

তিনি নিজেই বলেছেন, "কখনও কখনও দু'মাসেও হয়ত একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।"

সে-সময় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যেন আনন্দের হাট বসে যেত। কত ভক্ত আসতেন, নাচ, গান, কীর্তন, ভাবসমাধি দিনরাতই চলত। মা সারদা খুব কাছে থেকেও যেন বহুদূরে থাকতেন, সেই আনন্দের হাটে যোগ দিতে পারতেন না। দূর থেকে সবকিছু দেখতেন, সবকিছু শুনতেন, আর ভাবতেন, "আমি যদি ওই ভক্তদের মত একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।"

স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলছেন (শ্রীমা সাবদাদেবী, পৃঃ ৮৭)ঃ একদিকে স্বতন্ত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যদিকে স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ জগন্মাতা, একদিকে লীলাবিলাস, অপর দিকে সতৃষ্ণ নিরীক্ষণ—এ এক অপূর্ব চিত্র!

তবু আনন্দময়ী মা বলছেন "কি আনন্দেই ছিলুম। কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাট বসে যেত।"

কোথায় আক্ষেপ? এতো পরিতৃপ্তিরই পূর্ণতা।

* * *

শুধু একা নরেন্দ্রনাথ নয়, একে একে সন্তানরা এসে মাতৃচরণে স্থান পেতে থাকেন।

একদিন লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ধ্যানে বসেছেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "আরে, তুই যাঁর ধ্যান করছিস তিনি তো নহবতে বসে ময়দা ঠেসছেন।"

তারপরই লাটুকে নিয়ে হাজির করলেন মায়ের কাছে, বললেন, এ ছেলেটি বেশ, এ তোমার ময়দা ঠেসে দেবে, রুটি বেলে দেবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, করে দেবে।"

এভাবেই রামচন্দ্র দত্তের পশ্চিমাভৃত্য লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করলেন। পেলেন মায়ের আশ্রয়।

আরেকদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন নহবতে। তারপর মা সারদাকে দেখিয়ে বললেন, "ওঁর চরণ ধরে পড়ে থাক, ওখানে তোর সব হবে।"

এই সন্তানই যোগেন মহারাজ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সন্ন্যাসী সন্তানরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা লাভ করেছিলেন, শুধু যোগেন এবং সারদা মহারাজের দীক্ষা হয় মা সারদার কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনি ছিলেন বিবাহিত। ঠাকুর একবার তাঁর স্ত্রীকে দেখতে চাইলেন।

একদিন রাখালের স্ত্রী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে বললেন ঃ মেয়েটি বিদ্যাশক্তি, রাখালের ক্ষতি করবে না।

নহবতে মায়ের কাছে ঠাকুর খবর পাঠালেন, "আমার রাখালের বৌ এসেছে। খালি হাতে পুত্রবধূর মুখ দেখতে নাই। টাকা দিয়ে যেন আশীর্বাদ করেন।"

মা সারদা পরম স্নেহে পুত্রবধূকে গ্রহণ করলেন, টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

বধূও সারাজীবন মাকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করেছেন।

চারদিকে বেড়া দেওয়া নহবতের ওই ছোট্ট ঘরটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "খাঁচা। আগেই বলেছি, সেই খাঁচায় একসঙ্গে মা সারদা এবং লক্ষ্মীমণি অনেক সময় থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "শুক ও সারী।"

মন্দিরে মা কালীর পূজা হয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা প্রসাদ রামলাল দাদাকে দিয়ে বলতেন, "ওরে খাঁচায় শুক-সারী আছে, ফল মূল, ছোলা-টোলা কিছু দিয়ে আয়।"

একথা শুনে নবাগত বা অপরিচিত লোকেরা ভাবতেন, সত্যি বোধহয় ঠাকুরের পোষা কোন পাখী আছে। এমনকি, কথামৃতকার মাস্টারমশাই (শ্রীম) পর্যন্ত সেরকমই ভেবেছিলেন।

রহস্যময় শ্রীরামকৃষ্ণ রসময়ও।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ ও জনৈক ভক্তের মধ্যে কার গায়ের রং ফর্সা, তা নিয়ে তুমুল তর্ক দেখা দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত সেই তর্কের মীমাংসা করার ভার অর্পিত হল মা সারদার ওপর।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ দেহের রং গলিত সোনার মত ছিল, তবু মা সারদা ওই ভক্তের পক্ষে রায় দিয়েই বলেছিলেন, সে-ই একটু বেশি ফর্সা।

সে সময়কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেছেন (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৮৯) ঃ "বস্তুতঃ এই দেবদম্পতির প্রেমপ্রবাহ উভয়কুল-প্রসারী ছিল ; শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রতি মায়ের যতটা টান ছিল, মায়ের প্রতি ঠাকুরের টানও তদপেক্ষা কম ছিল না।"

এই প্রসঙ্গে গৌরীমার একটি মন্তব্যও স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, "এই যে দুজনের মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে থেকেও কখনও কখনও ছ'মাসেও হয়ত একদিন দেখা নেই, তবু দু'জনে ভাবই ছিল কত।"

একবার মা সারদার মাথায় হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হল। এ খবর পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বারবার রামলালকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন "ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে ?"

এরকমই ছিল দু'জনের সম্পর্ক।

আরেকবারের ঘটনা মা সারদাই বলেছেন। "ঠাকুর একবার

বেণী পালের বাগানে রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি—তুমি কেন এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা। তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও। তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন ? তিনি তো হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়া দাওয়ার পরেই একখানা গাড়ি ডেকে দিতে বললেন। কথা ছিল—রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বললে, 'এত রাতে গাড়ি পাব কোথায় ?' ঠাকুর বললেন, 'তা পাবে যাও'। তারা তো গিয়ে গাড়ি আনলে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাগান বাড়িতে রাত্রে না থেকে গাড়িতে চেপে মন্দিরে এলেন। মা সারদার কানে পৌঁছে গেছে গাড়ির শব্দ। তিনি শুনেছেন ঠাকুরের সঙ্গে রাখালের কথাবার্তার আওয়াজও। মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

মা বললেন, "শুনেই ভাবলুম, ওমা কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এই রাতে ? অন্যদিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম —এই সুজি হোক, যাই হোক। কেননা কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিক-তো ছিল না। তা সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখিনি। মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব নাম করতে লাগলেন, কি করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন। আমি বলছি, 'ও যদুর মা (ঝি), কি হবে ? তিনি শুনে বুঝতে পেরে তাঁর ঘর থেকেই ডেকে বলছেন 'তোমরা ভেব না গো, আমরা খেয়ে এসেছি'।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ কত বিষয়েই না মা সারদাকে উপদেশ দিতেন।

মা নিজেই বলছেন, "ঠাকুর বলতেন কর্ম করতে হয় ; মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।"

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কতকগুলি পাট এনে মা সারদাকে দিয়ে বললেন "এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখব, লুচি

রাখব ছেলেদের জন্য।”

মা বলছেন, “আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম, আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম। চটের ওপর লটলটে মাদুর পাততুম, আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে ঘুম হত—এখন এই সবে (খাট বিছানা) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাৎ বোধ করি না।”

অমন সর্বত্যাগী মানুষ হয়েও ঠাকুর সাংসারিক দায়-দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হতেন না। তাঁর অবর্তমানে মা সারদার যাতে কোন কষ্ট না হয়—সেদিকেও তাঁর সর্তক নজর ছিল।

একদিন তাই তিনি মা সারদাকে প্রশ্ন করলেন, “তোমার ক টাকা হলে হাতখরচ চলে?”

মা বললেন, “এই পাঁচ ছ’ টাকা হলেই চলে!”

তারপরই ঠাকুর জানতে চাইলেন, “বিকালে কখানা রুটি খাও?”

এমন প্রশ্নের জন্য মা প্রস্তুত ছিলেন না—লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন। খাবার কথা কি করে বলবেন?

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণেরও সেই এক প্রশ্ন।

অগত্যা মা বললেন, “এই পাঁচ ছ খানা খাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে মনে কি ভেবে তারপর বললেন, তাহলে “পাঁচ ছয় টাকায় তোমার চলে যাবে।”

পরে তিনি তাঁর ভক্ত বাগবাজারের বলরাম বসুর কাছে ওই পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রাখেন। বলরামবাবু ওই টাকা নিজের জমিদারিতে খাটিয়ে ছয় মাস অন্তর ত্রিশ টাকা সুদ মা সারদাকে পাঠিয়ে দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ভালো গান করতেন, তেমন ভালো নাচতেন। মা সারদা বলছেন, “আহা, গান গাইতেন তিনি, যেন মধুভরা। গানের ওপর যেন ভাসতেন। সে গান কান ভরে আছে।”

আবার মা বলছেন “নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার। ঠাকুর বড় ভালবাসতেন।”

দক্ষিণেশ্বরের প্রসঙ্গে মা সারদা একদিন বললেন, "একদিন আমি রঙ্গন ফুল আর জুঁই ফুল দিয়ে সাত লহর মালা গেঁথেছি। বিকেলে মালা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে (ভবতারিণী) পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একবারে ভাবে বিভোর। বারবার বলতে লাগলেন, আহা, কালো রঙে কি সুন্দরই মানিয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এমন মালা গেঁথেছে।'

সেখানে উপস্থিত একজন বললেন, মা সারদা এই মালা গেঁথে পাঠিয়েছেন।

একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

বৃন্দে ঝি গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে এল।

মা বলছেন, "মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরামবাবু (বসু) সুরেনবাবু (মিত্র)—এরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন, আমি তখন কোথায় লুকুই। বৃন্দের আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে (মন্দিরের) পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে বললেন, 'ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ওই কথা শুনে বলরামবাবুরা সরে দাঁড়ালেন। এবার মা মন্দিরের সামনের সিঁড়ি দিয়েই উঠলেন। তারপর? মা বলছেন, 'গিয়ে দেখি—মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালবাসে।' আবার একবার গোলাপ মাকে বলেছিলেন, 'ও সারদা, সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।'

একবার হৃদয়কে বললেন, 'দেখ তো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে (মা সারদাকে) ভাল করে দু'ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে—।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ। তবু তিনশ টাকা দিয়ে মা সারদাকে তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন। অথচ নিজে তিনি টাকাকড়ি ছুঁতে পর্যন্ত পারতেন না।

মায়ের প্রসঙ্গে ঠাকুর ঠাট্টা করে বলতেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।'

মা বলছেন, 'পঞ্চবটীতে (ঠাকুর) সীতাকে দেখেছিলেন—(সীতার) হাতে ডায়মনকাটা ((ডায়মণ্ড) বালা। সীতার সেই বালা দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার দেহবুদ্ধিরহিত পবিত্র সম্পর্কের মধ্যেও দাম্পত্য জীবনের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ছিল সদা জাগ্রত। এটাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়।

দক্ষিণেশ্বরে তখন নিত্য আনন্দসভা।

কত মানুষ আসছেন। কত মানুষ এসেছেন।

আর নহবতে বন্দিনী মা সারদা আনন্দ সভার অন্তরালে বসে সকল সন্তানের আনন্দ-বিধানে সদা চঞ্চলা।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে মা সারদাকে বললেন, 'আজ নরেন খাবে, ভাল করে রেঁধো।'

মা সযত্নে নরেনের জন্য রুটি, মুগের ডাল ইত্যাদি রান্না করলেন।

নরেন্দ্রনাথের খাওয়া হয়ে গেলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "রান্না কেমন খেলি রে?'

উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'হয়েছে ভালই, রুগীর পথ্যের মত।'

ঠাকুর গেলেন নহবতে, বললেন, 'নরেনের জন্যে ভাল করে ঘন ডাল আর মোটা রুটি তৈরি করবে। আজকের রান্না পছন্দ হয়নি।'

পরে একদিন মা নরেন্দ্রনাথের পছন্দমত ডালরুটির ব্যবস্থা করলেন, সেদিন নরেনের সে কি আনন্দ। এতে আনন্দিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণও। তিনি নহবতে গিয়ে সেই আনন্দের কথা মা সারদাকেও জানিয়ে এলেন।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণের টানে দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সমাগমও বাড়ছে। ভক্তরা ঠাকুরের জন্য ফল, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তিনি সবকিছুই নহবতে পাঠিয়ে দেন।

মা সারদা সবকিছুর অগ্রভাগ ঠাকুরের জন্য রেখে বাকি সব পাড়ার বালক-বালিকা ও সমাগত ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এ ব্যাপারে মা ছিলেন মুক্তহস্ত।

একদিন মা যখন সবকিছু বিলিয়ে দিচ্ছেন হাসিমুখে, তখন সেখানে উপস্থিত গোপালের মা বলে উঠলেন, "বউ মা, আমার গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণের) জন্য কিছু রাখলে না ?"

মা একটু লজ্জায় পড়ে গেলেন—সত্যি তো, তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মা মাথা নীচু করে নিরুত্তর।

ঠিক তখনই নবগোপালবাবুর স্ত্রী এক চাঙ্গারি সন্দেশ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন, চাঙ্গারিটা তুলে দিলেন মায়ের হাতে। মা-ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন মা সারদার এই স্বভাবের কথা।

তাই একদিন মা কোন কাজে তাঁর ঘরে এলে ঠাকুর একটু অনুযোগের সুরেই বললেন, "এত খরচ করলে কি ভাবে চলবে ?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না মা। একটু চুপ করে থেকে ধীর পায়ে ফিরে গেলেন নহবতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বিব্রত হয়ে পড়লেন, ডাকলেন নিজের ভাইপো রামলালকে, বললেন: ওরে রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।

এটাও কি মা সারদার মাতৃশক্তির কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বেচ্ছা-পরাজয় বরণের দৃষ্টান্ত নয়?

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ পেটের অসুখে প্রায়ই ভুগতেন—একথা আমরা আগেই জেনেছি।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা করতে এলেন কুমারটুলির কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। কবিরাজ জল বন্ধ করে ওষুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিলেন।

এতে উদ্বিগ্ন হয়ে ঠাকুর এসে মা সারদাকে প্রশ্ন করলেন: "হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে পারব?"

মা বললেন: "পারবে বৈ কি।"

এবার ঠাকুর চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বললেন: "বেদানা পর্যন্ত জল পুছে দিতে হবে, দেখ যদি তোমরা পার।"

একথা শুনে মা উত্তর দিলেন: "তা' মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।"

শেষ পর্যন্ত জলপান না করেই ঠাকুর ওষুধ খেতে শুরু করলেন।

মা সারদা জলের বদলে প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে তিন-চার সের, এমনকি পাঁচ-ছয় সের পর্যন্ত দুধ দিতেন। মা ওই দুধ ঘন করে দেড় সেরের মত বানিয়ে ঠাকুরকে দিতেন।

ঠাকুর জানতে চাইতেন: "কত দুধ?"

মা বলতেন: "কত আর হবে—এক সের, পাঁচ পো।"

কিন্তু তাতে ঠাকুরের সংশয় দূর হত না, বলতেন, "না, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।"

একদিন খাওয়ার সময় গোপালের মা এসে হাজির। ঠাকুর তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন: "হ্যাঁ গা, কত দুধ হবে?"

গোপালের মা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই দুধের আসল পরিমাণটা বলে দিলেন।

—এঁ্যা, এত দুধ? তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ঠাকুর

নিজের মনেই বললেন। তারপর মা সারদাকে ডেকে পাঠালেন।

মা আসতেই ঠাকুর জানতে চাইলেন, "কত দুধ?"

মা আগের মতই উত্তর দিলেন।

শেষপর্যন্ত ঠাকুরের সত্যি সত্যি পেটের অসুখ করল।

কিন্তু মা ঠাকুরের কাছে সত্য গোপন করেছিলেন সেই কারণেই, যে কারণে মায়েরা শিশুকে খাওয়াতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এটা সত্য থেকে সরে আসা নয়। ঠাকুরের কল্যাণ কামনায় মায়ের প্রীতিপূর্ণ প্রবোধ।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যনিষ্ঠায় হিমালয়সদৃশ। তাই, যখনই গোপাল মায়ের কাছে দুধের আসল পরিমাণ শুনলেন, অমনি তার প্রতিক্রিয়া তিনি নিজের দেহের মধ্যেই অনুভব করলেন।

আরেক দিনের ঘটনা।

সেদিন খাওয়াদাওয়ার পর ঠাকুর দেখলেন মুখশুদ্ধির মসলা নেই। মসলা আনতে নহবতে গেলেন।

মা সারদা তাঁকে একটু যোয়ান-মৌরি খেতে দিলেন এবং কিছু একটা কাগজের মোড়কে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যাও।"

ঠাকুর মোড়কটি হাতে নিয়ে নিজের ঘরে চললেন।

কিন্তু একি হচ্ছে? ঠাকুর কিছুতেই নিজের ঘরের দিকে যেতে পারছেন না—যতবার যাওয়ার চেষ্টা করছেন, ততবার তিনি নহবতের দিকে চলে আসছেন। চলে যাচ্ছেন গঙ্গার দিকে। আর বারবার বলছেন, "মা, ডুবি? মা, ডুবি?"

মা সারদা নহবতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন—কিন্তু বাইরে যে ছুটে যাবেন, তারও উপায় নেই। তাই চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখে চরম উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকেন।

এমন সময় কালীবাড়ির এক ব্রাহ্মণ সেখানে এসে পড়েন। মা তাঁকে দিয়েই হৃদয়কে ডাকিয়ে এনে বিপদ থেকে রক্ষা পান।

কিন্তু এমন হল কেন?

ওই যে কাগজের মোড়কে ঠাকুর কিছু একটা সঞ্চয় করেছিলেন।

অসঙ্কয়ী পরমহংস সত্যভঙ্গ করেছিলেন। তাই, তাঁর এই অবস্থা।

*　　　*　　　*

প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ভাতের থালা নিয়ে মা সারদাই যেতেন ঠাকুরের ঘরে। কিন্তু একদিন সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন গোলাপ মা-কেই বললেন ভাতের থালা নিয়ে আসতে।

সেই থেকে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হল।

নহবতের ওই ছোট্ট কুঠুরিতে বসে দিনে একবার—যখন ঠাকুর ঝাউতলায় যেতেন, শুধু তখনই মা সারদা তাঁর দর্শন পেতেন। এ এক দুশ্চর কঠিন তপস্যা। এত কাছে থেকেও কতদূরে সরে গেলেন তিনি।

গোলাপ মা একদিন মা সারদাকে বললেন, "মা, মনোমোহনের মা বলছিল, ঠাকুর অতবড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভালো দেখায় কি?"

একথা শুনে সেদিনই মা হাতের দু'গাছি সোনার বালা ছাড়া সব কিছু খুলে ফেললেন।

আরেক দিন এক মহিলা এসে বললেন: "তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন?"

সর্বংসহা মা সারদা ঠাকুরের কাছে যাওয়াও বন্ধ করলেন। সে এক নীরব যন্ত্রণার অমিয় কাহিনী। তিনি তো জানেন, ঠাকুর তাঁর একার নয়।

মা সারদা একে একে যখন সবকিছুই ত্যাগ করতে শুরু করলেন, তখনই যেন কোন এক অশুভ বার্তা মায়ের অন্তরকে বারবার মথিত করে তুলছিল। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ যেন স্পষ্ট হতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বছর পাঁচেক আগেই মা সারদাকে বলেছিলেন, "যখন যার-তার হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব, আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার আর বেশি দেরি নেই।"

সেই আশঙ্কাই যে মা সারদার মনের আকাশে কালো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সব অশুভ সংকেতগুলিই যে বারবার চোখের

সামনে ভেসে উঠছে।

ইদানীং ঠাকুর নানাজনের হাতে নানাস্থানে ভোজন করছিলেন। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে রাত্রিবাসও করছিলেন। আর একদিন সকালে নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে এনে ঠাকুর নিজের জন্য প্রস্তুত ঝোলভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে বাকিটা নিজে ভোজন করেছিলেন। মা সারদা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে এতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আপত্তি গ্রাহ্য করেননি।

তাই মা সারদার মন গঙ্গার মতই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। নিজের অজ্ঞাতে কোথায় কিছু একটা ঘটতে চলেছে, সেটা বুঝতে পেরে তিনি যেন আনমনা এবং উন্মনা হয়ে পড়ছিলেন। ঠাকুর ছাড়া তাঁর যে আর কিছুই নেই। কিন্তু কাকে বলবেন সে কথা?

হঠাৎই একদিন ভেঙ্গে গেল দক্ষিণেশ্বরের আনন্দমেলা।

১৮৮৫ সালের জুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগ প্রকট হয়ে দেখা দিল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" বলা হয়েছে ঃ "আজ মঙ্গলবার, ১১ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন।...তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন, রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন; বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন?"

"শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, না।"

অবশেষে তাঁর সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল।

প্রথমে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে আনা হয়। কিন্তু সেটা ঠাকুরের পছন্দ হয়নি। তাই পায়ে হেঁটে তখনই তিনি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে (এখন যেটা "বলরাম মন্দির" বলেই বিখ্যাত) চলে আসেন।

তারপর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেখানেই প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁকে রাখা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে চিরকালের জন্য চলে এলেন।

কিন্তু মা সারদাতো সেখানেই রয়ে গেলেন।

সে সময় দক্ষিণেশ্বরে চরম দুঃখকষ্টের মধ্যে মা সারদার দিনগুলি যেন দুঃস্বপ্নের মতই অতিবাহিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন না, জানতে পারছেন না তাঁর কোন খবরও। শুধু উদ্বেগ, শুধু অতঙ্ক।

সেই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপেক্ষা আর অবহেলার মর্মান্তিক যন্ত্রণা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনিও দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে চলে এলেন শ্যামপুকুর বাটিতে—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। মা কি আর দূরে থাকতে পারেন?

*　　　　*　　　　*

শ্যামপুকুর থেকে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হল কাশীপুর উদ্যান বাটিতে। মাও এলেন সেখানে। সে এক ভিন্ন কাহিনী। স্বতন্ত্র অধ্যায়।

এই কাশীপুর উদ্যানবাটিতেই যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ত্যাগী সন্তানদের নিয়ে সংঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিলেন এবং সেই সংঘের নেতৃত্বে নরেন্দ্রনাথকে করেছিলেন অভিষিক্ত, তেমনি অবগুণ্ঠনবতী মা সারদাকে সঙ্ঘজননীর আসনে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিতা।

ঠাকুর একদিন মা সারদাকে বলেছিলেন, "আমিই সব করব, তুমি কিছু করবে নাই" সেই করার ভার তিনি মায়ের হাতে অর্পণ করেছিলেন কাশীপুর উদ্যান বাটিতেই—যেখানে তিনি ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী স্বয়ং হয়েছিলেন কল্পতরু।

*　　　　*　　　　*

১৮৮৫ সালের রথযাত্রার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজরে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থানের পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে মা সারদাকে বলেছিলেনঃ "যখন দেখবে অধিক লোক একে (শ্রীরামকৃষ্ণকে)

দেবজ্ঞানে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি করবে, তখন জানবে এর (নিজের) অন্তর্ধানের সময় হয়ে এসেছে।”

তাহলে কি সত্যি সময় হয়ে এসেছে? কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হলেন। সবাই তাঁকে অবতারজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করছেন। দেবজ্ঞানে পূজা করছেন। তবে কি সেই অনিবার্য বিদায়ের ক্ষণটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে? মা সারদার বুকে অজানা আশঙ্কায় ঝড় ওঠে।

অশুভ লক্ষণগুলি একে একে স্পষ্ট হতে থাকে।

ঠাকুর কাশীপুরে আসার পর কলকাতার কয়েকজন ভক্ত সে খবর না পেয়ে নানারকম মিষ্টি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির।

সেখানে ঠাকুরকে না পেয়ে ঠাকুরের ছবির সামনেই ভোগ দিয়ে তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কাশীপুরে সেই সংবাদ যখন এল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: “ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে কেন দিলে?”

অকল্যাণের আশঙ্কায় মা সারদাও ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন।

মা সারদার বিচলিত অবস্থা দেখে ঠাকুরই আবার আশ্বাস দিয়ে বললেন, “ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এরপর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।”

সকলেই বুঝতে পারলেন লীলাসংবরনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত।

তারপর ঠাকুর যেদিন ইষ্টকবচখানা নিজের হাত থেকে খুলে মা সারদার হাতে তুলে দিলেন, সেদিন নিশ্চিতভাবেই বোঝা গেল, মহাপ্রস্থানের সময় সমাগত।

এবার মা চললেন তারকেশ্বরে হত্যা দিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণও এতে আপত্তি করলেন না।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসার দিন থেকে কতবার বাবা তারকনাথের চোখের সামনে দিয়েই মা সারদা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। আবার ফিরে গেছেন কামারপুকুর বা জয়রামবাটিতে। তারকেশ্বর তাঁর বহুদিনের চেনা—একান্ত অভয় আশ্রয়।

তারকেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণর প্রাণ ভিক্ষা করে দুই দিন নিরম্বু উপবাসে কাটালেন তিনি। কিন্তু তাতেও বাবা তারকনাথের কৃপা পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

তৃতীয় রাত্রে মা যখন হত্যা দিয়ে মন্দির প্রান্তে শায়িতা, তখনই এক অশ্রুতপূর্ব প্রচণ্ড শব্দে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল, তাঁর মনে হল, এজগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণ হত্যা করতে বসেছি?

মুহূর্তের মধ্যে মায়ার আবরণ সরে গেল। চোখের সামনে ফুটে উঠল অসীম বৈরাগ্যের ভাস্বর দীপ্তি।

মা উঠে বসলেন। তারপর কোন রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে স্নানজলের কুণ্ড পেলেন। এক গণ্ডুষ জল তুলে নিলেন। পিপাসায় শুকিয়ে যাওয়া ওষ্ঠে ঢেলে দিলেন সেই জল। মা সারদার প্রাণ একটু সুস্থ হল।

*　　　　*　　　　*

১৮৮৬ সালের আগস্ট মাস।

ঠাকুর মা সারদাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। মা এলেন। নত মুখে। নীরবে।

ঠাকুর মাকে দেখেই বললেন, "দেখ গো, কেন জানি না, আমার মনে সর্বদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে।"

জননী তখন পাষাণ-প্রতিমা। মা সারদা বুঝলেন, ঠাকুরের মন ব্রহ্মেলীয়মান হতে চলেছে। কোন শক্তি আর ওকে ধরে রাখতে পারবে না।

তারপর এল সেই ১৫ই আগস্ট। রবিবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে বসে আছেন। সকলের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া। চোখের জল আর ধরে রাখতে পারছেন না কেউ। তবু প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রাখছেন।

মা সারদা আর লক্ষ্মীদিদি এসে ঢুকলেন ঠাকুরের ঘরে। চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এসেছ ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি— জলের ভেতর দিয়ে, অনেক দূর।"

এবার আর মা সারদা নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না। বুকের পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস, চোখের বাঁধন ছিঁড়ে নেমে এল জলের ধারা। মা কেঁদে ফেললেন। আর কত সহ্য করবেন ? সহ্যের সীমা যে অনেক আগেই ভেঙে গেছে।

ঠাকুর বললেন, "তোমাদের ভাবনা কি ? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্র প্রমুখ) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।"

মা সারদার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোল না। বাষ্পরুদ্ধ তাঁর কণ্ঠ।

সেবক সন্তানদের জন্য খিঁচুড়ি বসিয়ে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে দেখেন, খিঁচুড়ির নিচের অংশ ধরে গেছে। উপরের অংশ থেকে সন্তানদের পাতে দিলেন। নিজে নিলেন নিচের অংশে পোড়া খিঁচুড়ি।

একটা শাড়ি শুকোতে দিয়েছিলেন ছাদে। কোনদিন কিছুই হারায় না। অথচ সেদিনই সেই শাড়িটি হারিয়ে গেল।

আর একটি জলের কুঁজো ছিল। সেটিও হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অমঙ্গলের বার্তা পদে পদে।

"ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের কৃশ তনুখানি মৃদু কাঁপিতেছে। জীর্ণপঞ্জর-পিঞ্জর ছাড়িয়া মহান আত্মা মহাকাশে বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মেলিয়াছে। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত।"

সর্ব ধর্মের সাধনা, সিদ্ধি ও সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ—শ্রীরামকৃষ্ণ সুমধুর কণ্ঠে তিনবার মহামন্ত্র মাতৃনাম "কালী, কালী, কালী" উচ্চারণ করে শ্রাবণ সংক্রান্তির পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

ধীর পায়ে মা সারদা যখন এলেন, তখন তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে দেখলেন, তাঁর পরম আরাধ্য প্রিয়তমের দেহ নিষ্কম্প, দৃষ্টি স্থির, মুখ-মণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

নিষ্কম্প দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর বুকভাঙা আর্তনাদ ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে, "মা কালীগো, কোথায় গেলে গো?"......।

পরম পুরুষের দিব্যদেহের স্পর্শে কাশীপুর শ্মশানভূমি রূপান্তরিত হল মহাতীর্থে।

মা সারদা ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেদিন এসেছিলেন এক সংশয় আর শংকা বুকে নিয়ে, "আমার স্বামী কি সত্যি পাগল?"

আর তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে শ্যামপুকুরে এসেছিলেন ১৮৮৫ সালের অক্টোবরে। প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। সেদিনও তাঁর মনে ছিল শঙ্কা আর আতঙ্ক, "ঠাকুর বাঁচবেন তো?"

শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬ সালের ২১ আগস্ট তিনি কাশীপুরও ত্যাগ করেন। সেদিন তাঁর জীবন-ধন আর সঙ্গে নেই।

তারপর দীর্ঘপথ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। দেবী হয়েও মানবীর বেশে বরণ করে নিতে হয়েছে সহস্র দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা।

১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর যাঁর জন্ম, সেই সারদার বিয়ে হয়েছিল ১৮৫৯ সালের মে মাসে। মাত্র ছ'বছর বয়সে। পুতুল খেলার বয়সে সংসার লীলায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন।

স্বামী হারা হয়েও প্রায় ৩৩ বছর তিনি সংসারের দুঃখ কষ্টের ভার বহন করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, মা সারদার জীবন তিনটি ভাগে স্পষ্টভাবেই বিভক্ত। ১৮৫৩ থেকে ১৮৮৫ এই ৩৩ বছর তিনি বালিকা এবং বালিকা থেকেই অবগুণ্ঠনবতী। ঠাকুর সামনে তিনি নেপথ্যে। তারপর ঠাকুরের অবর্তমানে ১৮৮৬ সালের আগস্ট থেকে ১৮৮৭ সালের আগস্ট, এই এক বছর সংঘজননীরূপে আবির্ভাবের প্রস্তুতিকাল। সবশেষে ১৮৮৭ থেকে ১৯২০ এই ৩৩ বছর তিনি সংঘজননী। এবার তিনিই সামনে। ঠাকুর নেপথ্যে।

ঠাকুরের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্যই যেন তিনি এই পৃথিবীতে এই ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। তারপর ১৯২০ সালের ২১ জুলাই তিনিও প্রস্থান করেন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে।

* * *

যিনি "সতের মা" "অসতেরও মা" যিনি "ভালোর মা", "মন্দেরও মা" সেই জননী সারদামণির অমৃতসমান জীবন কথার বৈচিত্র্যময় ঘটনাধারায় বারবার দেখি তিনি যেমন সবলের মা, তেমনি দুর্বলেরও মা; আর্ত পীড়িত-অবহেলিতের মা, আবার শোকে দুঃখে জর্জরিত মানুষের জীবনে একমাত্র আশার আলো। তিনিই বরাভয়দায়িনী জননী।

দুঃখের আঁধার রাত্রি যাঁদের জীবনে অনন্তকালের তপস্যা, বঞ্চনার অভিঘাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন যাঁদের— তাঁরাই এই "সত্যিকারের মায়ের" কাছে পেতে পারেন নিরাপদ ও নির্ভয় আশ্রয়।

শুধু সেদিন নয়, শুধু তাঁর সমকাল বা ক্ষণকালের মানুষই নয়, চিরকালের মানুষই সেই মাতৃত্বের জীবন জাগানিয়া স্পর্শে বেঁচে উঠেছে, বেঁচে উঠতে পারে, আর প্রাণ-মন সমর্পণ করে শুনতে পারে সেই শাশ্বত আশ্বাস: "জানবে তোমাদেরও একজন মা আছেন।"

জননী সারদামণির নরদেহ ত্যাগের তখনও পাঁচ দিন বাকি। রোগ-জর্জর দেহ নিয়েও তিনি অপরিমেয় দিব্যশক্তিতে তখনও মানুষের প্রাণে জ্বালিয়ে চলেছেন নিত্য নতুন আশার আলো।

সেদিন ভক্ত অন্নপূর্ণার মা এসেছেন বাগবাজারে† মায়ের বাড়িতে মাকে দেখতে। কাছে গিয়ে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন "মা আমাদের কি হবে?"

করুণা বিগলিত ক্ষীণকণ্ঠে সেদিনও অভয় দিয়ে মা থেমে থেমে বললেন ঃ "ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?" একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বললেন ঃ "তবে একটি কথা বলি, যদি শান্তি পেতে চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার (শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী পৃঃ ৫৫৬)।"

আর্ত-পীড়িত-দুঃখী মানুষের জন্যই তাঁর এই পৃথিবীতে আসা, তাঁদের জন্যই সংসারের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের সমুদ্রমন্থন করে সবটুকু বিষ ধারণ করেছেন নিজের দেহে—আর তাই বিদায় নেওয়ার আগে শোনালেন অমোঘ বার্তা ঃ "জগৎ তোমার"।

কিন্তু এই সংকটের লগ্নে এসেও সেই বার্তা কি আমাদের মনে প্রবেশ করেছে?

আমরা তাঁকে বুঝি বা না বুঝি—তবু জানি, "তিনি আমাদের মা"। সকলের মা। শ্রেণী বিচার নেই, জাত বিচার নেই, নেই গোত্রবিচারও। বরং যে সন্তান দুর্বল—তার দিকেই মায়ের টান বেশী।

স্বামী সারদেশানন্দ (শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা পৃঃ ৪৯) লিখেছেন ঃ "মায়ের বাড়িতে কুলি মজুর, গাড়িওয়ালা, পালকি বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনি-জেলে যেই আসুক, সকলেই তাঁর পুত্রকন্যা, সকলেই ভক্তগণের মত স্নেহ আদর পায়।"

তাইতো দেখি তাঁর অপার অনন্ত করুণাধারায় অবগাহন করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে কত অভাজন। শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর অনুসরণে আমরা

† বাগবাজারের উদ্বোধন লেনে এখন যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, সেই বাড়িতে মা আসেন ১৯০৯ সালের ২৩ মে। এখানেই লীলাসংবরণ পর্যন্ত (১৯২০ সালের ২১ জুলাই) তিনি অবস্থান করেন। এটাই মায়ের বাড়ি বলে পরিচিত।

জানতে পারি সেই ভাগ্যবান সাপুড়ের বৃত্তান্তও (সারদা-রামকৃষ্ণ, পৃঃ ৪৩০-৩১)।

সেদিন একদল সাপুড়ে ডুগডুগি বাজিয়ে জয়রামবাটির পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে তারা এসে পৌঁছুল মায়ের বাড়ির কাছেই। ডুগডুগির শব্দ মায়ের কানেও গিয়েছে—তিনি নিতান্তই একটি বালিকার মত সাপের খেলা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু সাপুড়েদের ডাকাবেন কাকে দিয়ে? কাছে পিঠে কেউ তো নেই। শেষ পর্যন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে সাপুড়েদের ডেকে নিয়ে এলেন। সাপুড়েরা খেলা দেখালে কত নেবে—তা ঠিক না করেই তিনি ওদের বললেনঃ তোমরা ভালো করে খেলা দেখাও, আমি তোমাদের খুশি করে বখশিস দেব।

ডুগডুগির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের মানুষ এসে ভিড় করল সাপের খেলা দেখতে। বাঁশি বাজিয়ে মনের আনন্দে সাপুড়েরা অনেক রকম খেলা দেখাল।

খেলা শেষ হলে মা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের দুটি টাকা, একটা কাপড় এবং মুড়ি গুড় খেতে দিলেন।

মাতৃস্নেহে ধন্য সাপুড়েরাও খুবই অভিভূত।

বিদায়কালে ওদের দলপতি মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করল।

মা-ও কোন সংকোচ না করে সেই সাপুড়ে সন্তানদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

এই দৃশ্য দেখে মায়ের এক ভ্রাতৃবধূ রীতিমত অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন, 'সাপুড়েকে টাকা দিয়েছ, কাপড় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ—এইতো বেশ। ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু?'

জননী সারদা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কী করে তাকে বারণ করি? প্রণামই যদি করলে, আর আমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি? এ তোমাদের কেমনতর কথা?'

সেই যে আশীর্বাদ—যা জাতগোত্রের কোন বন্ধন মানেনি, যা,

ডাকাত অমজাদ থেকে শুরু করে এক অন্ত্যজ সাপুড়ের মাথায়ও হয় অঝোরে বর্ষিত—সেই চিরকালের এবং অনন্তকালের আশীর্বাদ আজও গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের মতই করুণাধারায় প্রবাহিত।

দুঃখীদের জীবনে, আর্ত-পীড়িতের যন্ত্রণায়, অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া হতাশা জর্জর প্রাণে সেই আশীর্বাদই নতুন করে বেঁচে ওঠার একমাত্র আশ্বাস।

বাংলা ১৩২৭ (ইং ১৯২০) সালের শ্রাবণ মাসের সেই ৪ঠা শ্রাবণ —আকাশের মেঘে মেঘে সঞ্চারিত হয়েছিল বাষ্পরুদ্ধ অশ্রুধারা—মা' তাঁর নরদেহ ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত।

স্নেহের কাঙাল যে অসংখ্য মানুষ, ভালোবাসার ভিখিরি যে হাজার হাজার প্রাণ—সেদিন সবাই সবকিছু হারাবার আশঙ্কায় রুদ্ধবাক।

কিন্তু মা—চিরকালের মা, সকলের মা সেই দুঃখভারাক্রান্ত জীবের কথা সেদিনও বিস্মৃত হননি।

তাই বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন আগেই চির কল্যাণময়ী মা অতি করুণার্দ্র কণ্ঠে মহাকালের বুকে ছড়িয়ে দিলেন আশীর্বাদের ফুল, বললেন, "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানকে জানিয়ে দিও মা—আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"

আর আছে বলেই তো দুঃখী ও আর্তমানুষ আজও দুঃখের সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে বেঁচে ওঠার দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়—যেখানে জননী করুণাময়ীর আশীর্বাদ তাদের একমাত্র সম্বল।

—

এই বইটির যাবতীয় তথ্য যে সকল বই থেকে নেওয়া হয়েছে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	শ্রী'ম'
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ	স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি	অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীমা সারদাদেবী	স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই খণ্ড)	উদ্বোধন প্রকাশিত
শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা	'শ্রী' লিখিত
সারদা-রামকৃষ্ণ	শ্রীদুর্গাপুরী দেবী
গৌরী মা	সারদেশ্বরী আশ্রম
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা	স্বামী সারদেশানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে	স্বামী ঈশানানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)	স্বামী গম্ভীরানন্দ
Sri Sarada Devi	Sri Ramkrishna Math Madras
শ্রীমা	আশুতোষ মিত্র
শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি	স্বামী নির্লেহানন্দ
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পরিশিষ্ট	দিব্যজীবনধারা
মা সারদার জন্ম	২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩
বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে যাত্রা	মে, ১৮৫৯
দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গমন	ডিসেম্বর, ১৮৬০
জয়রামবাটিতে দুর্ভিক্ষ	১৮৬৪
তৃতীয়বার শ্বশুরালয়ে গমন	মে, ১৮৬৬
চতুর্থবার শ্বশুরালয়ে গমন	জানুয়ারি, ১৮৬৭
পঞ্চমবার শ্বশুরালয়ে গমন (শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কামারপুকুরে)	মে, ১৮৬৭
দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার এলেন	মার্চ, ১৮৭২
মা সারদাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজা করেন	৫ জুন, ১৮৭২
মা সারদার পিতার দেহত্যাগ	২৬ মার্চ, ১৮৭৪
দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যান	১৮৭৪
জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পূজা	নভেম্বর, ১৮৭৫
মা সারদার শাশুড়ির গঙ্গালাভ	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬
তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে এলেন	১৭ মার্চ, ১৮৭৬
চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে	জানুয়ারি, ১৮৭৭
পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বরে	মার্চ, ১৮৮১
হৃদয়রামের দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ	জুন, ১৮৮১ (স্নানযাত্রার দিন)
ষষ্ঠবার দক্ষিণেশ্বরে	জানুয়ারি, ১৮৮২
সপ্তমবার দক্ষিণেশ্বরে	জানুয়ারি, ১৮৮৪
অষ্টমবার দক্ষিণেশ্বরে	মার্চ, ১৮৮৫
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে শ্যামপুকুরে গেলেন	অক্টোবর, ১৮৮৫
মা সারদা কাশীপুরে	১১ ডিসেম্বর— ১৬ আগস্ট, ১৮৮৬
শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে বৃন্দাবন যাত্রা	৩০ আগস্ট, ১৮৮৬
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন	৩১ আগস্ট, ১৮৮৭
পতিহারা মা সারদা কামারপুকুরে	সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭
মা সারদার মাতৃবিয়োগ	জানুয়ারি, ১৯০৬
কলকাতায় মায়ের বাড়িতে মা	২৩ মে, ১৯০৯
লীলা সংবরণ	২১ জুলাই, ১৯২০